* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড *

* কলিকাতা বারো *

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বি. বি. রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭।এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদচিত্র :
শ্যামল সেন

বাঁধাই :
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা

সূচীপত্র

রঙের গোলাম

নদীর পুলটি পেরিয়ে মুন্সি-পাড়াব ছোট্ট স্টেশনে এসে প্যাসেঞ্জার গাড়িটি দাঁড়াল। সকাল সাড়ে সাতটা এখনও বাজে নি। এরই মধ্যে বৈশাখেব বৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছে।

আসবাব সময় ঠাকুমা বলে দিয়েছিলেন, পাড়াগাঁ, বিদেশ-বিভুঁই। শ্বশুববাড়ি যাচ্ছিস এই প্রথম। ব্যাগের মধ্যে কড়াপাকের সন্দেশ বইল, ইস্টিশানে নেমে জল খেয়ে নিস ভাই। নাতবৌকে নিয়ে না ফেবা পর্যন্ত সবাই পথ চেয়ে থাকব। দুর্গা দুর্গা—

কথাটা সুশীলেব মনে ছিল।

কলকাতার জীবনটা সহজ, কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামেব একটি স্টেশন-প্লাটফবমে এসে নামলে উপস্থিত সমস্যাটাকে এত সহজ মনে হয় না। কথা ছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে দু-একজন কেউ-না-কেউ এসে স্টেশনে অপেক্ষা করবে। তারাই নৌকা আনবে এবং পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু চোখের সামনে সীমা-হীন নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুশীল দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। কেউ আসে নি।

হ্যাণ্ডব্যাগটি ঝুলিয়ে নিয়ে এখানে-ওখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সে একসময়ে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মাস্টারমশাই মুখ তুলে বললেন, আপনাকে তো দেখলুম এই গাড়িতে এলেন। কোথায় যাবেন?

সুশীল বললে, শাম্‌তা যাব। কিন্তু,—এখানে দেখছি নে কারোকে—

শাম্‌তা? সে যে অনেক দূর। আজকাল নৌকো তো যায় না, কচুরি জমেছে অনেক। তা ছাড়া বালুতে লগি ঠেলা যায় না। আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে। শাম্‌তায় কাদের বাড়ি যাবেন?

চৌধুরীদের ওখানে!

মাস্টারমশাই এবার ভালো করে কলকাতার এই ছোকরার দিকে তাকালেন। তারপর একটু মিষ্ট হেসে বললেন, আপনি কি হরগোপালবাবুর জামাই সুশীল রায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

দাঁড়ান দাঁড়ান—মাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—সবই গেছে গণ্ডগোল পাকিয়ে। আপনার দুখানা চিঠি আর জরুরী টেলিগ্রাম আমার কাছে পড়ে রয়েছে,—চৌধুরীদের ওখানে আজও ডেলিভারি দেওয়া হয় নি।

সুশীল প্রশ্ন করল, সে কি? কেন?

আর কেন! একজন রানারের কলেরা, আরেকজন ছুটি না নিয়েই বাড়ি গেছে। কে ডেলিভারি দিয়ে আসবে বলুন? আঁটপুরের পোস্টমাস্টারমশাই আমার লোকের হাতে চিঠি আর টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছেন, ডেলিভারি দিয়ে দুটাকা বকশিশ

চেয়ে নিয়ো চৌধুরীদের কাছ থেকে। আজ ভাবছিলুম যা হোক করে পাঠাব।

বুঝতে পারা গেল এই কারণেই শামৃতার কোনো লোক এসে পৌঁছয় নি। সুশীল বললে, কিন্তু আমি তো পথঘাট চিনি নে, শামৃতা যাব কেমন করে, বলে দিতে পারেন ?

মাস্টারমশাই বললেন, আপনি গিয়ে একটু বসুন ওই ঘাটের ধাবে ডাক-বাংলায়, আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি। নদীতে এখন জল নেই বললেই হয়, তাই নৌকো পাওয়া বড্ড কঠিন। আপনি গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি। আপ্-গাড়িখানা ছেড়ে দিয়েই আমি আসছি।

ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে সুশীল নির্দিষ্ট পথের দিকে অগ্রসর হল।

পায়ে-চলা একটি পথ নেমে গেছে ঘাটের দিকে। নিচের অংশটায় ডাক-বাংলাব কোলে একটি মস্ত প্রাঙ্গণ। তারই উত্তর দিক ঘেঁষে দুটি পাকা ঘব আর একফালি বাবান্দা। কিছুদূরে একটি চালাঘর, সেটি বোধ করি খানসামা আর জমাদারের আস্তানা। এবাব কোথা থেকে যেন একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কাব ঠুকল! সুশীল এগিয়ে এসে বললে, একঘটি খাবার জল আনতে পাব ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বৈ কি। ওই তো পেছন দিকেই টিউব-ওয়েল্।

লোকটা তখনই ছুটতে ছুটতে চলে গেল। বকশিশ পাবার লোভ ছিল তার।

এক বৃদ্ধা বসে ছিল বারান্দার এক কোণে। কার উদ্দেশে যেন কি সে বকছে নিজের মনে। হাতের কাছে তার একটি ময়লা পুঁটলি। বুড়ি মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, কোথা যাবে গা ?

পায়াভাঙ্গা একখানা চেয়ারে সুশীল একটু সুস্থির হয়ে বসল, তারপর মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, শাম্‌তা যাব, বুড়িমা।

শাম্‌তা যাবে ? তালটুলি ছাড়িয়ে নাকি ?

কোথায় তালটুলি আর কোথায়ই বা শাম্‌তা—নবাগত সুশীলের কিছুই জানা নেই। সুশীল শুধু বললে, মাস্টারমশাই আসছেন, তাঁর কাছেই শুনতে পাবে।

বুড়ি আপন মনে আবার বিজবিজ করতে লাগল।

মিনিট দুই বাদেই চাকরটা এক ঘটি জল এনে রাখল। বললে, বেশ ভালো জল, বাবু—আপনি মুখ হাত ধোন, দরকার হলে আরও এনে দেব। যদি বলেন, চা বিস্কুট ডিমসেদ্ধ—এসব এনে দিতে পারি। এখানে যোগাড় আছে।

সুশীল বললে, যদি পার শুধু এক পেয়ালা চা আমাকে তৈরি করে দাও। খাবার কিছু দরকার নেই।

লোকটা আবার সোৎসাহে চলে গেল।

ব্যাগটি খুলে সুশীল সন্দেশের মোড়কটি বার করবার উদ্যোগ করছে এমন সময় একটি ছিপছিপে কাঁচা বয়সের মেয়ে বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বুড়িকে প্রশ্ন করল, গলাবাজি করছিলে কেন ? যাবে তো যাও না! সাঁতরে যেতে চাও, যাও—নৌকো নেই।

মেয়েটার চোখ দুটো লক্ষ্য করে সুশীলের পক্ষে মোড়কটি আর খোলা সম্ভব হল না। ব্যাগটি আবার বন্ধ করে সে কেবল ঘটি থেকে দু-ঢোক জল খেয়ে নিল।

বুড়ি আবার গজগজ করে উঠল, চোখে কি দেখতে পাই যে, গাঙ পেরোব? এখানে জল বেশি। দে না তুই পার করে আমাকে? লম্বা লম্বা কথা! আবাগি···নচ্ছার!

মেয়েটা সুশীলের দিকে একবার তাকাল। নবাগত এক ব্যক্তির সামনে গালমন্দ খাওয়াটা বোধ হয় তার গায়ে লাগল, সুতরাং সে তখনই বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, মুখ খারাপ করলে কিন্তু ভালো হবে না, মাসি, বলে দিচ্ছি। আমি পারব না, যা খুশি করগে।

মেয়েটা চলে যাচ্ছিল, বুড়ি ডাকল, শোন্, শুনে যা—

না, শুনব না। ভিক্ষের ভাগ দেবে আমাকে যে, তোমার গালমন্দ সইব? কে তোমার ধার ধারে?

মেয়েটা চলে গেল। সোজা গিয়ে সে ঢুকল চালাঘরটায়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে মাস্টারমশাই সেই পায়ে-চলা পথটি বেয়ে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন। আপ্-ট্রেনখানা মিনিট দুই আগে পেরিয়ে গেছে। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার জন্যে বিশেষ কিছুই করতে পারলুম না, সুশীলবাবু। গাঁয়ের জামাই আপনি, খাতির করবার কেউ নেই। তবে একখানা নৌকো যাচ্ছে নবীনগর অবধি,—ওই পর্যন্তই একটু জল আছে। নবীনগরে নেমে আপনি একখানা গরুর গাড়ি পেতে পারেন। আজ সেখানে হাট আছে।

সুশীল এতক্ষণে একটু ভরসা পেয়ে বললে, বেশ, গরুর গাড়ি হলেও যেতে পারব। কোনোমতে পৌঁছতে পারলেই হল।

মাস্টারমশাই বললেন, তাহলে আর দেরি করবেন না। অনেকটা পথ। নবীনগরে দোকান পাবেন,—দুধ কলা চিঁড়ে বাতাসা, এসব পাওয়া যাবে। এই নিন চিঠি দুখানা আর টেলিগ্রাম। সবই আপনার। হরগোপালবাবুকে বলবেন, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। চলুন, আপনাকে তুলেই দিয়ে আসি।—এই বলে চিঠি ও টেলিগ্রামটি তিনি সুশীলের হাতে গছিয়ে দিলেন।

ব্যাগটি নিয়ে সুশীল উঠে দাঁড়াতেই খানসামা চা নিয়ে এল। তার অন্য হাতে একটি কাগজের মোড়ক। সেটি দেখিয়ে সে বললে, এর মধ্যে আপনার জন্যে চারটে ডিমসেদ্ধ আর আটখানা বিস্কুট দিয়েছি।

সুশীল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, ডিম-বিস্কুট চাই নি তো?

কেন, যুমনি গিয়ে যে বললে আমাকে? তাই তো ডিম সেদ্ধ করে আনলুম। তবে ভাববেন না বাবু, এসব পথে আপনার লেগেই যাবে। মোট আপনার হয়েছে সাতসিকে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। এরকম আচরণে সুশীল মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হল। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন, মেয়েটার বিবেচনা আছে দেখছি। তা ভালোই হল, সারাদিনটাই পড়ে রয়েছে সামনে, ক্ষিধে তেষ্টা পাবে বৈ কি। যুমনি ভালোই করেছে।

বকশিশ সমেত ছুটি টাকা পকেট থেকে বার করে দিয়ে সুশীল চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিল। চা শেষ করতে মিনিট পাঁচেক লাগল বৈ কি। অতঃপর মাস্টারমশাই বললেন, আসুন, ঘাটের দিকে যাই।

বুড়ি ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুশীলের পিছু নিয়েছিল। ঘাটের ধারে নৌকার কাছে এসে বললে, আমাকে একটু জায়গা দাও গো বাবারা, আমি তালটুলিতে নেমে যাব। ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাই বাবা, একটু জায়গা দাও।

অনুমতিলাভের আগেই বুড়ি হাতড়ে-হাতড়ে হাঁটু অবধি কাদা মেখে নৌকায় গিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, অ যুম্‌নি, আয় লা আয়। উঠে পড়্।

মাস্টারমশাই বললেন, দেখুন ওদের কাণ্ড! শুধু পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার ফন্দি! কি আর করবেন সুশীলবাবু, দিন ওদের একটু জায়গা! গরীব বেচারা!

সুশীল বললে, তা বেশ, যাচ্ছে যাক্! ওদের কাছেই পথ-ঘাট জেনে নেওয়া যাবে।

যুম্‌নিও এসে নৌকায় উঠল। মাস্টারমশাই বলে দিলেন, নবীনগর থেকে শাম্‌তা হল সাড়ে পাঁচ কোশ,—গরুর গাড়ি না হলে চলবেই না। এখন মাঠ বড্ড শুকনো। ওখানে গেলেই আপনি গাড়ি পাবেন।

মাস্টারমশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে সুশীল গিয়ে নৌকায় উঠল। একখানা রুমাল বার করে খাবারটা বেঁধে নিল।

মাস্টারমশাই ফিরে গেলেন। লগি ঠেলে নৌকা ছেড়ে দিল।

উজান ঠেলে নৌকা চলেছে ধীরে ধীরে। বৈশাখের রৌদ্র অতি প্রখর। সুশীল ছইয়ের ভিতরে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসল। সকালের চায়ের তৃষ্ণাটা একপ্রকার মিটেছে, ঘণ্টা দুই এখন নিশ্চিন্ত। ব্যাগটি খুলে আরেকটি রুমাল বার করে সুশীল মুখ-খানা মুছল। ছোট জানলার বাইরে নদীর দুপারে মাঠ। ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে। বাতাস এখনও তেমন গরম হয় নি। যাত্রাটা নতুন ধরনের—ভালোই লাগছে।

বাইরে একপাশে বসে রয়েছে যুম্‌নি আর তার পাশে বুড়ি। হাত দুখানা কপালের দিকে তুলে রোদ বাঁচাবার চেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু বুড়ির সঙ্গে যুম্‌নির তর্কাতর্কি লেগেই রয়েছে। তর্কের মূল বিষয়টি সুশীলের কাছে দুর্বোধ্য। তবে আন্দাজে বুঝতে পারা যায় এই, জোয়ান বয়সের মেয়েছেলেকে এড়িয়ে গিয়ে বুড়ো মানুষকে কেউ ভিক্ষে দিতে চায় না। সুতরাং তালটুলিতে নেমে নবীনগরের হাটতলা যাবার পথে যুম্‌নি যেন বুড়ির সঙ্গ না নেয়। যুম্‌নি কাছে-কাছে থাকলেই তার অসুবিধা। যুম্‌নি তার উত্তরে বলছে, আমি তোমার ভিক্ষেয় ভাগ বসাতে আসি নি। যা খুশি করগে তুমি। আমি গিয়ে হাটতলার কোথাও পড়ে থাকব। তুমি তালটুলিতে নেমে যেয়ো।

পড়ে থেকে কি করবি ? তোর মা যদি তোকে ঘরে ঢুকতে না দেয় ?

যুম্‌নি একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, নাই বা দিল ? কে সাধতে যাচ্ছে ? হাটতলায় ভাত ফুটিয়ে খেয়ে সোজা হাঁটা দেব বোষ্টমডাঙ্গায় ! আমি কি ও-মাগীর পরোয়া করি। মা, না ডাইনি !

সুশীল ওদের তর্কটা শুনছিল। যুম্‌নির দিকে এবার মুখখানা ফিরিয়ে বুড়ি একটু হাসল। বললে, ও বুঝেছি, সেই মরদটার কাছে এখন চললি বুঝি ? ছোঁড়াটা না খুনের মামলায় পড়েছিল ?

তোমার মাথা আর মুণ্ডু। সে কবে মরে ভূত হয়েছে !

তবে কোথায় চললি ?

যুম্‌নি একটু থেমে বললে, ওখানে ধানকলে কাজ দিচ্ছে।

বুড়ি বললে, সেই ভালো, কাজ কর,—মরদ না হয় নাই পেলি। তোর না একটা বাচ্চা হয়েছিল ? তাকে কোথায় পাচার করলি ?

যুম্‌নি একটু আড়ষ্ট হয়ে নৌকার ভিতরে একবার তাকাল। পরে বললে, তার কথা আর কেন ! সেও মরেছে !

বটে ! বুড়ি বললে, তোকে বুঝি আমি চিনি নে ? বল্‌ না কেন গাঙে ফেলে দিয়েছিস ?

যুম্‌নি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, নৌকার মাঝি এবার বললে, তোরা নামবি কোথা রে ? আমার পয়সা কে দেবে ?

বুড়ি বললে, ওমা, কথা শোনো। ভিক্ষেয় বেরিয়েছি, পয়সা পাব কোথায় ?

যুম্‌নি বললে. পয়সার কথা কি হয়েছিল তোর সঙ্গে ?

মাঝি চেঁচামেচি করে উঠল। যুম্‌নি একটু সরে গিয়ে ছইয়ের ভিতরে গলা বাড়িয়ে বললে, ও বাবু, আমাদের কাছে যে পয়সা চাইছে ? তুমি একটু বলে দাও না গো।

ঠাকুরমার কথাটা স্মরণ করে সুশীল তখন সবেমাত্র তার সন্দেশের মোড়কটি খুলে বসেছে। উদ্দেশ্য, একটি ডিমসিদ্ধ ও দুটি সন্দেশ খেয়ে সে প্রাতরাশ সারবে। যুম্‌নিকে গলা বাড়াতে দেখে সে একটু বিব্রত বোধ করে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা—তোমরা গিয়ে বসোগে, আমি বলে দিচ্ছি। পয়সা তোমাদের দিতে হবে না।

ওখান থেকেই সুশীল গলা বাড়িয়ে নৌকাওলাকে ডেকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তোমার ভয় নেই কর্তা, ওদের পয়সা আমিই দিয়ে দেব।

যুম্‌নি কিন্তু অত সহজে সামনে থেকে নড়তে চাইল না। বুড়ি যেন না শুনতে পায় এইভাবে একটু গলা নামিয়ে বললে, বাবু, চারটে ডিম তোমার জন্যে আমিই বলেছিলুম। দাও না আমাকে দুটো !

সুশীল সহসা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। যুম্‌নি আবার বললে, অত বিস্কুট, অতগুলো সন্দেশ—নাই খেলে তুমি ?

যুম্‌নির চাহনির মধ্যে কোথায় যেন একটা চাপা আক্রোশের লাল আভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। মেয়েটার পরনে একখানা

ছিন্ন জীর্ণ ধুতি। বুকের একটা অংশ তার ঢাকা পড়ে নি, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই। সুশীল চোখ দুটো নামিয়ে নিয়ে এল খাবারগুলোর দিকে। গা যেন তার ঘিনঘিন করে উঠল। কিন্তু যুমুনির সেই লুব্ধ রক্তিম দৃষ্টির দিকে মুখ আর না তুলেই সে বললে, এই নাও ডিম-বিস্কুট, নিয়ে তোমরা খাওগে যাও। এই সন্দেশও চারটে নিয়ে যাও।

বলতে বলতে সেই কাগজটির ওপরেই চারটে সন্দেশ তুলে দিয়ে সুশীল খাবারটা তার দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু যুমুনির মুখ চোখ তাতে যে খুব খুশী হয়ে উঠল তা নয়, সে যেন তার পাওনা নিয়ে নিল।

লগি ঠেলতে ঠেলতে নৌকা চলেছে উজিয়ে। মাঝে মাঝে অল্প জলের জন্য নৌকার নিচে বালুর ঘষা লাগছে। আবার প্রাণপণে লগি ঠেলে সেটাকে ঘন জলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইভাবে মাইল তিনেক পথ আসতে-আসতেই মধ্যাহ্ন-কাল পৌঁছে গেল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে ছইয়ের ভিতরটাও ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে।

সুশীল হাতঘড়িতে দেখল বেলা বারোটা বাজে। মনে মনে সময়ের হিসাব করে সে কূল-কিনারা পেল না। কিছুক্ষণ পরে ছইয়ের পিছনদিক থেকে গলা বাড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ওহে, নবীনগরের আর দেরি কত?

মাঝি জবাব দিল, তালটুলি পেরিয়ে যেতে হবে বাবু। এই এসে পড়েছি, আর দেরি নেই।

কচুরিপানায় নদীপথ আকীর্ণ। ওরই মধ্যে জল চিনে-চিনে নৌকা ঠেলে যাওয়া। হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে একখানা বই ছিল, সেখানা বার করে পড়বার উৎসাহ আর নেই। কড়াপাকের সন্দেশ গোটা-তিন-চার গিলে জলের পিপাসা পেয়েছে। কিন্তু কলেরার ভয়ে সেই পিপাসা সুশীলকে চেপে রাখতে হচ্ছিল।

আরও প্রায় আধঘন্টা পরে নৌকা এসে লাগল তালটুলিতে। বুড়ি এতক্ষণ অবধি সেই অগ্নিক্ষরা রোদ মাথায় নিয়ে বসে ছিল। এর মধ্যে যুম্‌নির খাবারের থেকে সে ভাগ পেয়েছে কিনা বলা কঠিন, কারণ খাবারগুলো নেবার পর কোনোদিক থেকে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায় নি। সুশীলের বিশ্বাস, যুম্‌নি একাই সেগুলো গিলেছে, অথবা তার একটা অংশ গোপন রেখেছে। সুবিধা ছিল এই, বুড়ি চোখে দেখতে পায় না।

তালটুলি এসেছে শুনেই বুড়ি উঠল। পুঁটলিটি ও লাঠিটি নিয়ে উঠে সে বললে, তুই কিন্তু নামতে পাবি নে এখানে, তুই যা নবীনগর। হাটতলায় যা হয় করিস। আমাকে নামতে দে।

যুম্‌নির বোধ করি ক্ষুধানিবৃত্তি হয়েছিল, সুতরাং সে আর প্রতিবাদ জানাল না। এমন সময় সুশীল গলা বাড়িয়ে বললে, ওহে মাঝি, তোমাদের এখানে ভালো খাবার জল পাওয়া যাবে ?

মাঝি বললে, হ্যাঁ বাবু, পাওয়া যাবে। এখানে নতুন সরকারী নল বসেছে। জল খুব ভালো।

যুম্‌নি সোৎসাহে বলে উঠল, আমি এনে দিচ্ছি বাবু, তোমাকে নামতে হবে না। ছুটে যাব আর আসব।

মাঝির কাছ থেকে ঘটিটা নিয়ে যুম্‌নি নৌকা থেকে নেমে পড়ল। বুড়িও নামল তার সঙ্গে। মাঝি গলা উঁচিয়ে বলে দিল, যাবি আর আসবি। ঘটি নিয়ে যেন গা ঢাকা দিস্ নে, মাগি।

মুখ সামলে কথা কস্ জয়নাল, বলে দিচ্ছি—যুম্‌নি পিছন ফিরে একবার আরক্ত চোখে তাকিয়ে মাঠ পেরিয়ে হনহন করে চলল।

নৌকা দাঁড়িয়ে রইল। মাঝি আর দাঁড়ি দুজন নেমে গিয়ে নদীর সেই জলে মাথা মুখ ধুয়ে নিল। সুশীল একসময় বললে, ওকে চোর বলা ভালো হয় নি, বুঝলে হে,—বেচারী গরীব লোক!

আপনি জানেন না বাবু, ওকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। খুনে মেয়েছেলে! দু-দুবার ফাটক ঘুরেছে! মেয়েটা ভারি ধড়িবাজ। আজ আপনার কাছে কিছু আদায় করে তবে ছাড়বে! একেবারে ছিনেজোঁক!

সুশীল একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল।

মিনিট পনেরো পরে এক ঘটি জল নিয়ে যুম্‌নি এবার একাই ফিরে এল। বুঝতে পারা গেল বুড়ি গেছে অন্যদিকে, নিজের পথ ধরেছে।

নৌকায় উঠে এসে যুম্‌নি এবার একটু খুশীমুখে বললে, তুমি জল চেয়ে নিলে, এ আমার ভাগ্যি বাবু। তোমরা কলকাতার লোক, এদিকের হালচাল জান না। শুধু জল কেন, ভিক্ষেও জোটে না!

পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পেয়ে সুশীল তখনই খানিকটা খেয়ে নিল। তারপর মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের হাত বুলিয়ে এক-সময় প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বলতে পার—কখন গিয়ে শামতা পৌঁছব?

যুম্‌নি বললে, বোধ হয় সন্ধ্যে হবে। মাঝপথে একটা বিল পড়বে, সেটা পেরিয়ে গেলে সরকারী রাস্তা—

গরুর গাড়ি পাব?

হ্যাঁ—আমি গাড়ি এনে দেব। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

সুশীল বললে, আমাকে গাড়িতে তুলে ঠিক রাস্তাটা বলে দিয়ো, তোমাকে বকশিশ দেব।

বকশিশ!—যুম্‌নি সোজা চোখ তুলে তাকাল। তারপর বললে, তোমার খাবার যে খেলুম তখন? কে তোমার বকশিশ চায়? বুঝেছি, জয়নাল এরই মধ্যে কানে তোমার মন্তর দিয়েছে, না?

এদিকটায় কিছু বেশি জল পেয়ে নৌকা একটু দ্রুত-গতিতেই চলছিল। লগিটা থামিয়ে ওধার থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জয়নাল। বললে, তোকে জানে না কে, শুনি? ভদ্দল্লোকের সঙ্গে আবার তর্ক করছিস? চুলের ঝুঁটি ধরে এখনই লা থেকে ফেলে দেব! ভয় করি নে তোকে।

ভীষণ বাঁকাচোখে যুম্‌নি একবার জয়নালের দিকে তাকাল। পরে বললে, তোর ভাইয়ের জন্যে বুঝি রাগ তুলতে চাস?

সাবধানে কথা বলিস, জয়নাল! ভিক্ষে করে খাওয়াই নি তোর ভাইকে? আবার লম্বা লম্বা কথা! নৌকো রাখ্, আমি নেমে যাচ্ছি—

সুশীল এবার বাধা দিয়ে বললে, থাক্ থাক্, ওসব ঝগড়া-ঝাঁটিতে আর কাজ নেই। রোদ্দুরে মাথা গরম করছ কেন? আর এইটুকু তো রাস্তা,—নামতে আর হবে না। শান্ত হয়ে বোসো।

জয়নাল চুপ করে গেল। যুম্‌নি মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

দুদিকে রৌদ্রদগ্ধ মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। দুইয়ের মধ্যপথে নদী যতদূর অবধি দেখা যায় কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। ওরই মাঝখানে কোথায় জল একটু গভীর, সেটি জয়নালরা জানে। বালু বাঁচিয়ে কচুরির ভিড় ঠেলে একসময় নৌকা এসে লাগল একটা মস্ত বটগাছের তলায়। এইটি নাকি নবীনগরের ঘাট। গ্রামের বাচ্চারা নদীতে নেমে জল নিয়ে মাতামাতি করছিল।

জয়নাল বলে দিল, এখান থেকে তিন পোয়া রাস্তা আপনাকে হেঁটে যেতে হবে, বাবু। হাটের পথ ধরলে তবে গরুর গাড়ি পাবেন।

হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে সুশীল নেমে এসে বটগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। যুম্‌নিও নামল। তারপর বললে, আমি কি যাব তোমার সঙ্গে বাবু? পথ যদি চিনতে না পার তাহলে যাই।

সুশীল বললে, তখন যে বললে গরুর গাড়ি একখানা ভাড়া করে দেবে ?

তাহলে যাই সঙ্গে, চলো !

নৌকাভাড়াস্বরূপ তিনটাকা জয়নালকে বুঝিয়ে দিয়ে সুশীল আগে আগে চলতে লাগল। ঘাট ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে ওরা নামল। সামনে পাওয়া গেল একটা বাঁশবাগান। রৌদ্র থেকে বাঁচবার জন্য ছায়ায়-ছায়ায় সুশীল চলতে লাগল। যুম্‌নি আসছিল পিছু-পিছু। একসময় সে বললে, তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবু—ব্যাগটা আমার হাতে দাও না ?

জয়নালের সতর্কবাণী সুশীলের মনে ছিল। সে বললে, না না, সে কি কথা ! হাজার হোক তুমি মেয়েছেলে,—লোকে বলবে কি ?

যুম্‌নি বললে, লোক তো কেউ নেই এখানে ?

সুশীল এবার থমকে দাঁড়াল। বললে, মেয়েছেলে বোঝা নিয়ে যাবে, আর আমি পুরুষমানুষ হয়ে খালি-হাতে হাঁটব, এ কি হয় ? চলো, এটা এমন কিছু ভারী নয়।

বেলা দেড়টা বেজে গেছে। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে রুমালটি নিয়ে সুশীল হনহন করে চলল। মেয়েটা আসছে পিছু-পিছু, কিন্তু বকশিশের লোভে নয়। কিছু খাদ্য পেয়েছিল, বোধ করি তারই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ গরুর গাড়ি একখানা যোগাড় করে দিতে চায়। এক সময় যুম্‌নি বললে, বাবু, এই বুঝি তুমি প্রথম শাম্‌তায় যাচ্ছ ?

সুশীল জবাব দিল, হ্যাঁ, তা বলতে পার।

মেয়েটা অনায়াসে চলছে। রৌদ্রে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। খালি-পায়ে শুকনো মাঠের কর্কশ-কঠিন পথ পেরিয়ে চলেছে, কষ্টের ও পরিশ্রমের কোনও চেতনাই নেই। রুমাল দিয়ে সুশীল বার বার নিজের কপালের ঘাম মুছছিল।

মাঠের মধ্যে তিন পোয়া পথ আন্দাজ করা যায় না। হয়তো এক মাইল, হয়তো-বা তারও বেশি। কিন্তু এই বেলাটুকুর মধ্যে এখনও অধিকাংশ পথ পেরিয়ে যেতে হবে। অদূরে বস্তি দেখা যাচ্ছে—এটা নাকি নবানগরের শেষ প্রান্ত। এখান থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ গেলে তবে হাটতলা। সুশীল একসময় থেমে বললে, গরুর গাড়ি ধরবে কোত্থেকে বলো তো?

চলো বাবু, এই আমরা এসে গেছি। ওই যে চালাঘরগুলো দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই গাড়ি পাওয়া যাবে।

সুশীল আবার মুখ বুজে চলল।

যুম্নির উৎসাহের শেষ নেই। অন্যের কিছু কাজ করে দেবার সুযোগ বোধ করি সে এই প্রথম পেয়েছিল। সুতরাং চালাঘর দেখে সে সুশীলকে পিছনে রেখে আগে-ভাগে এগিয়ে গেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে এসব অঞ্চল তার বিশেষ পরিচিত। একসময় পিছন ফিরে সে বললে, তুমি ওই আমগাছটার তলায় একটু দাঁড়াও, আমি দেখে-শুনে আসি।

ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত চেহারা নিয়ে সুশীল গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। এবারে তার প্রকৃতই দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদি

এদের সকলের আন্দাজ সত্য হয় তবে এখনও অন্তত দশ মাইল পথ বাকি। সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে শামুতায় সে পৌঁছতে পারবে কিনা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বেলা এখন ছুটো। সূর্যাস্তের এখনও চার পাঁচ ঘণ্টা বাকি। পাঁচ ছু-গুণে দশ মাইল। মনে হচ্ছে, ঘণ্টায় ছু-মাইল অবশ্যই গাড়ি যেতে পারবে। সুশীল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল।

আধঘণ্টা পরে দূরের থেকে যুমুনি হাতছানি দিয়ে ডাকল। সুশীল প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার কাছাকাছি এল। যুমুনি বললে, গাড়ি এখনও ফেরে নি বাবু, আজ হাটের বার কিনা।

তাহলে উপায় ?—থমকে দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে গেল সুশীল।

যুমুনি হাসিমুখে বললে, আমরা হলে পাঁচ কোশ পথ হেঁটেই চলে যাই। কিন্তু তুমি তো আর তা পারবে না। তা ছাড়া ঘুমুতির বিল পেরোতেই তো সময় লেগে যাবে। মাঝখানে এখন অনেক জল-কাদা। পারবে বাবু ?

মুশকিলে পড়ে গেল সুশীল। বললে, এদিকের পথঘাট আমার জানা নেই। বিলের চেহারা দেখে অবিশ্যি বলতে পারি, পারব কিনা।

চালাঘরের আশে-পাশে ছু-চারজন মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়েছিল। একজন প্রবীণ চাষী বললে, নাটুপাড়ায় নে যা, ওখানে মানু পালের একখানা গাড়ি আছে। ভদ্দরলোককে যা হোক করে পৌঁছে দে। তুই ওকে ধরলি কোথায় ?

যুমুনি জবাব দিল, ইস্টিশানে।

লোকটা বললে, বাবু, যত কষ্ট হোক আপনি আর দাঁড়াবেন না। কোশ-দেড়েক গিয়ে নাটুপাড়ায় উঠবেন, দেখুন যদি গাড়ি পান। এখানে হাট থেকে কখন গাড়ি ফিরবে কোনো ঠিক নেই। যুম্‌নি, তুই যা বাবুর সঙ্গে। দেড় ক্রোশ থেকে দু-ক্রোশ পথ।

সুশীলের গলা শুকিয়ে উঠেছিল দুর্ভাবনায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে একবার যেন সমগ্র বিরাট দেশের দুর্গম চেহারাটা অনুভব করে নিল। তারপর বললে, খাবার জল এখানে পাওয়া যাবে?

যাবে বৈ কি। আসুন বাবু চালার তলায়, একটু বসে যান। আপনারা কলকাতার লোক, মাঠে-ঘাটে কষ্ট হয় বৈ কি।

চালাঘরের নিচে এসে বাঁশবাঁধা একখানা বেঞ্চিতে সুশীল বসল। ভিতর থেকে একটা লোক এক ঘটি জল আর খান-চারেক বাতাসা এনে দিল। কিন্তু দশ মাইল পথ সামনে রেখে সুশীল এখানে বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারল না। বাতাসা ক-খানা চিবিয়ে একপেট জল গিলে সে আবার ব্যাগটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। যুম্‌নিও মুখে চোখে জল দিয়ে প্রস্তুত হল। পাশ থেকে কে একজন মেয়েছেলে চাপা-কণ্ঠে পরিহাস করে বললে, তোর কপাল ভালো, যুম্‌নি।

দুজনে সেই রৌদ্রে আবার হাঁটা-পথ ধরল। শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে যাত্রাটা ত্র্যহস্পর্শযোগে আরম্ভ হয়েছিল কিনা, সুশীল সেই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। জলযোগ করে সে একটুখানি সুস্থ হয়েছিল, তার লম্বা লম্বা পদক্ষেপেই

সে-কথাটি বুঝতে পারা যায়। যুম্‌নি নিজের মনেই আসছে পিছু-পিছু। তার ভাগ্য নাকি খুব ভালো, বিনা পারিশ্রমিকে কলকাতার লোকের কাজে লেগে গেছে। ঈর্ষা করার মতো ভাগ্য বটে।

পথের দূরত্বের পরিমাপ লোকের মুখে-মুখেই থাকে। নির্দিষ্ট নিশানা কিছু নেই। মাঠের এক মাইল পথ প্রকৃতই এক মাইল কিনা কেউ ভেবে দেখে না। আবার, বৈশাখের রৌদ্রে এক মাইলও তিন মাইল হয়ে ওঠে। নাটুপাড়ায় এসে পৌঁছতেই বেলা চারটে বাজল। এর মধ্যে গাছতলায় বসতে হয়েছে বার-ত্বই, ব্যাগ থেকে গামছাখানা বার করে ভিজিয়ে মাথায় বাঁধতে হয়েছে। জুতো খুলে পায়ের ফোসকায় হাত বুলোতে হয়েছে বার বার। ধিক্কার এসে গেছে শ্বশুড়বাড়ির দেশ সম্বন্ধে; পল্লীজীবন সম্বন্ধে ঘৃণা এসে গেছে। পায়ের যন্ত্রণায় কান্না চাপতে হয়েছে। খুন চেপেছে মাথায়।

যুম্‌নি একসময় উৎসাহিত হয়ে বললে, বাবু, তোমার কপাল বড় ভালো। মানু পালের গাড়িখানা আছে দেখছি। এবার আর ভাবনা নেই। আজই শাম্‌তা পৌঁছে যাবে।

যুম্‌নির চোখে পড়েছিল গাড়িখানা দুর থেকে, সুশীল তখনও দেখতে পায় নি। সুতরাং এবারও যুম্‌নি আগে-ভাগে নাটুপাড়ায় গিয়ে ঢুকল। মেয়েটার উৎসাহ এবং অধ্যবসায় অপরিসীম। যত আক্রোশই সুশীলের মনে জমুক না কেন, মেয়েটার প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

গাড়ি দেখলেই হয় না, তার মালিককে চাই। আবার মালিককে পেলেও কাজ হবে না। গরু দুটো যোগাড় করা দরকার। ছুটোছুটি করতে গিয়ে অনেকটা সময় লাগল। মানু পালকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে জ্বর নিয়ে উঠে এল। মোট চার ক্রোশ পথের জন্য সে হাঁকল পাঁচ টাকা। তাই সই। সুশীল মরিয়া হয়ে উঠেছিল। গরু দুটো আছে মাঠে,—যুমনি ছুটল মাঠের দিকে। ওতে লেগে গেল আরও আধ-ঘণ্টা। সুশীলের পায়ের ফোসকা উঠেছে দগদগিয়ে, হাঁটবার সাধ্য আর তার নেই। একখানে জুতোটা খুলে ব্যাগটা পাশে রেখে সে বসল।

গরু দুটোকে দড়ি ধরে এনে যুমনি যখন সামনে হাজির করল, ছিপছিপে মেয়েটার কপাল আর শুকনো চুল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নামছে। গরু দুটোকে গাছতলায় বেঁধে সে একরাশি খড় সংগ্রহ করে আনল। মানু পাল বললে, বাবু, ছইটা আছে আমার ঘরে। গরু বেঁধে আমি গাড়ি নিয়ে এগোই, আপনি আসুন। ছই বেঁধে খড় বিছিয়ে নেব। আসমানে মেঘ জমেছে, ছইটে দরকার।

পাঁচ রকম কাজে ঘণ্টাখানেক আরও লেগে গেল। মানু পাল পাঁচ টাকা হাঁকলেও তার গাড়ি চালাবার উৎসাহ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। গায়ে তার জ্বর, শরীরটা অবসন্ন। নিতান্ত টাকার লোভেই সে রাজী হয়েছিল।

সুশীলেরও ক্লান্তি ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে একখানা পা তার ফোসকার জন্য প্রায় অকর্মণ্য হয়ে এসেছিল। এই গাড়ি কখন এবং কত রাত্রে গিয়ে শামুতায় পৌঁছবে, সে হিসাব আর

সে করল না। কিন্তু গাড়িতে উঠে খড়ের বিছানার ওপর বসতে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল। পড়ন্ত রৌদ্রে তার মাথা ধরেছিল। ব্যাগটার ওপর একটু ভর দিয়ে সে কাত হয়ে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। যুম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেই চলতে লাগল। মান্নু পাল চলল তার পাশে-পাশে। গরু দুটো গাড়ি টানছে আপন খেয়ালে। মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে মান্নু পাল। এইটিই নাকি সরকারী রাস্তা। দক্ষিণ দিকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ গেলে তবে আঁটপুরের কাছারি। সেখান থেকে মুন্সিপাড়া আর দু ক্রোশ। শাম্‌তার পথ চলে গেছে উত্তরে।

সন্ধ্যা ছয়টায় কালবৈশাখীর আভাস দেখে সুশীলের মুখ চোখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এল। কালো মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বাতাস উঠেছে জোরে। কিন্তু যুম্‌নির মুখে চোখে না আছে ভয়, না ভ্রূক্ষেপ। বরং ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনায় তার যেন কোথাও কিছু একটা উৎসাহই ছিল। মাঠে ধান হবে, ভাতের ভাবনা ঘুচবে।

গলা বাড়িয়ে সুশীল বললে, ওদিকে আকাশের চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে এল! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দেখছ তো?

যুম্‌নি বললে, হ্যাঁ বাবু, ওদিকে ঝড় উঠেছে। তোমার ভাবনা নেই, ঠিক পৌঁছে যাবে।

কত রাত্রে পৌঁছব?

মান্নু পাল বললে, তা এক পহর হবে। রাস্তা কম নয় বাবু। ঘুম্‌তির বিল পেরিয়েও শাম্‌তা পৌঁছতে আড়াই কোশ।

যুম্‌নি বললে, ঘুম্‌তি তো এসে গেছে। কত জল হবে মান্থু ?

ঠিক জানি নে তো, চল্‌ দেখি। ধুবলির কাঁধে ঘা আছে, টানতে পারলে হয় !

গাড়িখানা দেখতে দেখতে এসে যখন ঘুম্‌তি বিলের জল-কাদায় নামল, তখন ঝড় উঠেছে। মাঠ-ময়দানের ঝড় কেমন, সুশীলের আগে জানা ছিল না। প্রান্তরের চারিদিক ধুলোয় আর ঝড়ের বেগে ঘোরালো হয়ে এসেছে ! মাঝে মাঝে আকাশ কড়কড় করে উঠছিল। গাড়িখানা এগোচ্ছে কাদার ভিতর দিয়ে। সুশীল কাঠ হয়ে বসে ছিল। কাদা ছাড়িয়ে একসময় জলের মধ্যে গাড়িখানা নামল। যত এগোয়, জল বেশি। ওই জল-কাদার মধ্যে নেমেছে যুম্‌নি আর মান্থু পাল। কিন্তু গাড়ির মধ্যে বসে একসময় নিচের দিকে ভিজে-ভিজে ঠেকতেই সুশীল ভয় পেয়ে সহসা বলে উঠল, ও গাড়োয়ান, এ কি হল ? তলা থেকে জল উঠছে যে ? এ কোনদিকে নিয়ে এলে ?

যুম্‌নিরও প্রায় কোমর অবধি জল উঠেছে, মান্থু পালেরও সেই দশা। বিরক্ত হয়ে যুম্‌নি বললে, তখন না তোমাকে বললুম, বিলের পাড় দিয়ে ঘুরে চলো ? সোঁতার মধ্যে গাড়ি ঢুকল, এখন কি করবে

পিছন থেকে গাড়িখানা টেনে মান্থুপাল গরু দুটোকে থামাল। তারপর বললে, ঘুরতে গেলে যে এক কোশ রাস্তা বাড়ে, দেখছ না ?

তাই বলে বাবুকে জলে চোবাবে? গাড়ি যে ডুবল! গরুর নাক অবধি জল উঠেছে! ফেরাও গাড়ি।

কিন্তু ওই কথা কাটাকাটির সময়টুকুর মধ্যে কালবৈশাখার আকাশ ভেঙে পড়ল। বজ্র বিদ্যুৎ এবং ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি নেমে এল। মেঘের করাল ছায়া আচ্ছন্ন করেছে দিকদিগন্ত।

সুশীল ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, না না, আর এগিয়ো না, গাড়ি ফেরাও। জল বেড়ে যাচ্ছে। এ আমি পারব না।

মানু পাল জলের ভিতরে নেমে গিয়ে গরু দুটোকে ধরল। ঘুম্‌নি গিয়ে প্রাণপণে ধরল গাড়ির পিছন দিকটা। নানা কৌশল, কসরৎ ও সংগ্রামের পর সেই বৃষ্টির মধ্যে মানু পাল গরু দুটোর মুখসমেত গাড়িখানাকে আবার ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু সেই জল-কাদা ভেঙে ঢালুপথের উপরদিকে গাড়িখানাকে টেনে আনতে যতটা সময় লেগে গেল, তারই মধ্যে মানু পাল আর ঘুম্‌নির অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠল। এবার চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টির সাপটে আর ঝড়ের তাড়নায় সবাই দিশেহারা হয়ে গেল।

ছইয়ের ভিতরে বসে সুশীল বললে, এভাবে যাওয়া যাবে না, বুঝেছ ঘুম্‌নি? কাছাকাছি গাঁ আছে কোথাও? খানিকক্ষণ যদি অপেক্ষা করে যাই?

মানু পাল এবার বেঁকে বসল। বললে, গাঁ আছে বটে ছুপোয়া রাস্তা গেলে, ঘুম্‌নি জানে। কিন্তু আমি ওখানে বসে থাকতে পারব না, বাবু। একটা গরুর ভাবগতিক ভালো নয়,

হয়তো মরবে! তা ছাড়া কাল সকালে আঁটপুরের কাছারিতে আমাকে হাজরে দিতে হবে!

সুশীল বললে, তুমি গাড়িভাড়া পাবে, তবে যাবে না কেন? এত বৃষ্টিবাদলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবে? এসব কি বলছ?

যুম্‌নি বললে, তখন একথা বললেই হত?

মানু পাল বললে, আপনাকে গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আমি যাব। আমাকে গোটা দুই টাকা দেবেন। যা দেখছি, আজকে আর আশা নেই। আমি বসে থাকতে পারব না।

বৃষ্টি প্রবল। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। অন্ধকারে ছইয়ের মধ্যে বসেও সুশীল বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজছিল। বললে, আমার আর কিছু বলবার নেই। তাই চলো।

গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে মানু পাল অগ্রসর হল। যুম্‌নিও এগোল ভিজতে ভিজতে। একসময় সুশীল সকৃতজ্ঞকণ্ঠে গলা বাড়িয়ে বললে, তুমি আমার জন্যে যে কষ্ট করলে, এ আমি ভুলব না যুম্‌নি, শাম্‌তায় গিয়ে সকলের কাছে তোমার গল্প করব।

যুম্‌নি কোনও কথার জবাব দিল না। ঝড় ও জলের ঝাপটায় মাঝে মাঝে সে টাল খেয়ে যাচ্ছিল। সর্বাঙ্গ দিয়ে তার জল ঝরছে।

এ দুর্যোগের মধ্যে দুপোয়া পথ কতদূর ঠিক আন্দাজ করা যায় না। অন্ধকার তখনও ঘন হয় নি বটে, কিন্তু বৃষ্টির ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করতে গেলে সবই একাকার মনে হচ্ছে! সুশীলের কাপড় জামা জুতো ব্যাগ—সমস্তই ভিজে সপসপ করছে।

কোথায় গিয়ে আপাতত মাথা বাঁচাবে, সেটা যুমনিই জানে। গরুর গাড়ি নিয়ে মানু পাল এরপর চলে গেলে একমাত্র যুম্‌নি ছাড়া তার আর কোনো ভরসাই থাকবে না। কিন্তু এত বৃষ্টির মধ্যে কোনো কথা তলিয়ে ভাববারও সময় নেই।

সরকারী মেটে রাস্তা খানাখোন্দলে ভরা। মাঝে মাঝে চাকা বসে গিয়ে গাড়িতে ধাক্কা লাগছে। ছইয়ের মধ্যে বসে সুশীলের মাথা ঠুকে যাচ্ছে, পেটের নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকাচ্ছে। খানার মধ্যে যখন গড়গড়িয়ে নামছে, উপুড় হয়ে পড়ে তখন আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে। এইভাবে তথাকথিত দুপোয়া রাস্তা পেরিয়ে এসে গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, সেটার নাম বুঝি কুমোর-পাড়া। ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না,—সামনেই বোধকরি ছোটখাটো একটা হাটতলা। কয়েকটা বাঁশের ওপর গোটা পাঁচ-ছয় আটচালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে ঝড়ে গোটা দুই চালা কাত হয়ে পড়েছে।

গাড়িখানা মচমচ শব্দ করে একসময় থেমে গেল। পাশেই কোন একটা বস্তির থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ওগুলো কুমোরদেরই ঘর, ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ধুপধুপ করে আওয়াজ উঠছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে যুম্‌নি এবার এগিয়ে এসে সহসা চাপা-কণ্ঠে বললে, এখানে চেঁচিয়ে কথা বোলো না। ওকে টাকা দিয়ে দাও বাবু, ও চলে যাক্।

সুশীল দুটি টাকা বার করে মানু পালের হাতে দিয়ে দিল। মানু পাল খুশী হয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। সুশীল ব্যাগটি হাতে নিয়ে

নেমে এসে একখানা চালার তলায় দাঁড়াল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল চালার বাইরে, কিন্তু সেই ক্ষণকালের আলোয় কেউ কারোকে স্পষ্ট করে দেখতে পেল না। বহুক্ষণ ওদেরকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

বৃষ্টির সাপট এবার একটু কমেছে। গাড়ি নিয়ে নমস্কার জানিয়ে মাম্নু পাল তার পথের দিকে এগিয়ে চলল।

ব্যাগটি খুলে একখানা গামছা বার করে সুশীল গা-মাথা মুছল, তারপর বললে, রাত্রের মধ্যে শাম্‌তা পৌঁছতে পারব তো?

যুম্‌নির আচরণে তার যে প্রকৃতিগত উগ্রতা সারাদিন ধরে প্রকাশ পেয়ে এসেছে, সেটা যেন কালবৈশাখীর ঝড়জলের তাড়নায় এবার শান্ত দেখাচ্ছিল। সে ঠিক তেমনি চাপা-কণ্ঠে বললে, তুমি যদি পারো, বাবু, আমার আপত্তি নেই। আমি সঙ্গে গিয়েই পৌঁছে দেব। তবে রাত হবে অনেক।

অন্ধকারে হাতঘড়ি দেখা যায় না। কিন্তু আন্দাজে বুঝতে পারা গেল, রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সুশীল বললে, এখান থেকে আর কতটা পথ হবে?

যুম্‌নি বললে, তা ধরো, প্রায় তিন কোশ। আমরা যে আবার খানিকটা উজিয়ে এলুম। আর কিছু না, বিল পেরোতে সময় লাগবে। অন্ধকারে সাবধান হয়ে হাঁটতে হবে তো?

সাপখোপ জন্তু-জানোয়ারের ভয় আছে নাকি?

ওসব কপালের কথা, বাবু।

ব্যাপারটা কি জানো, যুম্‌নি,—আমার আর এগোতে ভরসা

নেই।—সুশীল বললে, একে তো ঝড়বৃষ্টি অন্ধকার, তার ওপর জুতোটা এখন আর পরা চলবে না। নতুন জুতোটা পরে না এলেই হত। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্, বুঝলে যুমনি? এই চালাটার তলায় বসে থাকি। গরমকালের রাত, দেখতে দেখতে পুইয়ে যাবে। ভোরবেলা হেঁটেই চলে যাব।

যুম্‌নি বললে, রাত্তির হলে এখানে বন-শুয়োর আসে, বাবু। হাটতলা কিনা।

চমকে উঠল সুশীল, এবং পলকের মধ্যে সমগ্র অন্ধকার বিশ্বচরাচর সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে এল। প্রশ্ন করল, তুমি কি করে জানলে, যুম্‌নি?

এখানে যে আমি আসি-যাই। আমার চেনা লোক আছে। বাবু, একটা কথা রাখবে?

কি বলো?

একটু থতিয়ে যুম্‌নি বললে, রাত্তিরে তুমি যেতে পারবে না, এখানেও বসে থাকতে পারবে না। বেণী মোড়লের ওখানে যদি রাতটা থেকে যাও—কাল সকালে হেঁটেই যেতে পারবে।

বেশ তো, ভালো কথা!

কিন্তু ওখানে আমার ইজ্জত আছে, বাবু। এ চেহারায় যাব না।

তাহলে কি করবে?—মুখ তুলে সুশীল তাকাল।

যুম্‌নি বললে, তোমার ব্যাগের মধ্যে তখন কাপড় দেখেছিলুম, আমাকে দেবে একখানা?

সুশীল কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। পরে বললে, আমার স্ত্রীর

জন্যে খান-দুই নতুন শাড়ি ওর মধ্যে আছে বটে। তবে হ্যাঁ, তোমার একখানা দরকার বৈকি। জামাও একটা দিতে হয়। বেশ, দিচ্ছি নাও।

সুশীল একখানা রঙীন শাড়ি ও জামা বার করে যুম্‌নির হাতে দিল। খুশী হয়ে যুম্‌নি বললে, তুমি একটুখানি বোসো বাবু, আমি এখুনি আসছি।

হাটতলা থেকে বেরিয়ে যুম্‌নি হনহন করে একদিকে চলে গেল। সামনে বন-বাঁদাড়, অদূরে মস্ত বাঁশঝাড়,—সমস্ত মিলিয়েই যেন বনশুয়োরের আতঙ্ক। সুশীল কাঠ হয়ে বসে রইল। মেয়েটা তার সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক আদায় করে নিয়ে পালিয়ে গেল কিনা—ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু একাকী অন্ধকারে অজানা গ্রামের জীর্ণ হাটতলায় বসে ভীতচক্ষে সুশীল পাথরের টুকরোর মতো স্থির হয়ে রইল।

অন্তত ঘণ্টাখানেক হবে। অদৃষ্টের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সুশীল অপরিসীম নৈরাশ্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, এমন সময় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটল। যুম্‌নি এসে দাঁড়াল সামনে। আন্দাজে দেখা গেল, নতুন শাড়িখানা সে পরেছে, মাথার চুল ফিরিয়েছে,—চেহারাটা সম্পূর্ণ বদল করে নিয়েছে। এদিকে ঝড়-বৃষ্টিও থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

সুশীল বললে, তোমার দেরি দেখে বড্ড দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম! কোথায় যেন তখন রাতটা কাটাবার কথা বলছিলে?

যুম্‌নি বললে, হ্যাঁ বাবু,—আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

সুশীল এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ব্যাগটা এক হাতে নিল, অন্য হাতে নিল জুতো জোড়াটা।

যুম্‌নি বললে, তা কি হয়? ওরা বলবে কি? জুতোটা আমার হাতে দাও, বাবু।

বলতে বলতে সে জুতো-জোড়াটা হাত থেকে একপ্রকার কেড়েই নিল।

অতি সন্তর্পণে কয়েক পা অগ্রসর হতে দূরের পথে একটা আলো দেখা গেল। যুম্‌নির গতিভঙ্গিতে কোথায় যেন প্রবল একটা অস্বস্তিবোধ ছিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বললে, ওই ওরা তোমাকে নিতে আসছে, বাবু। একটা কথা বলে রাখি, ওরা যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, তুমি যেন কোনো জবাব দিতে যেয়ো না। তোমার পায়ে পড়ি বাবু,—আমার ইজ্জত যেন না যায়। আমাকে চেনে সবাই। তুমি যেন কিছু মনে কোরো না। তোমারও ইজ্জত আমি রেখে চলব—দোহাই বাবু।

অন্ধকারে তার মুখ-চোখের ব্যাকুল চেহারাটা ঠাহর করা গেল না বটে, কিন্তু যুম্‌নির করুণ কণ্ঠেব কাকুতি শুনে সুশীল থমকে দাঁড়াল। পরে বললে, ব্যাপার কি, যুম্‌নি?

কিছু না বাবু, কিছু না। তোমাকে দেখে নানা কথা উঠবে কিনা, তাই আগে বলে রাখছি। তুমি কিছু জবাব দিয়ো না, এই আমার ভিক্ষে। ওদের কাছে আমার মান রেখো, বাবু। সে অনেক কথা, পরে তোমায় বলব।

ততক্ষণে আলো নিয়ে জন-দুই চাষী মেয়ে ছেলে এবং মোড়ল এগিয়ে এসেছে।—আশেপাশে ঘিরে রয়েছে পাঁচটি ছোট ছেলেমেয়ে।

মোড়ল কাছে এসে আলোটা তুলে ধরে বললে, তাই তো বটে, মিছে বলে নি। কপালটা তোর ভালো রে, যুম্‌নি! আসুন বাবু, আসুন— ঘরে নিয়ে যা রে বৌ।

ওর মধ্যে একটা বউ এসে হাসিমুখে সুশীলের হাত ধরে আগুন পেরিয়ে একটি গোলপাতার ঘরের দাওয়ায় নিয়ে তুলল। একটা মেয়ে ঘটি করে আনল পা ধোবার জল। বুঝতে পারা গেল, এরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটা সোরগোল পড়ে গেল। বোধহয় এরই মধ্যে কোনও একটা কোণে রান্নার আয়োজন চলছে। দেখতে দেখতে সেই অন্ধকারে একটিমাত্র হারিকেনের ভরসায় আশেপাশে ক্ষুদ্র একটি জনতা জমে উঠল, এবং তাদেরই মাঝখান দিয়ে মূল্যবান শাড়ি এবং জামা পরে গৌরবগর্বিতা যুম্‌নি হাসি-হাসি মুখে চলাফেরা করতে লাগল।

সুশীল প্রথমটা হতচকিত হয়ে উঠেছিল। মনে ভয় ছিল, পাছে এই হট্টগোলের মধ্যে তার হ্যাণ্ডব্যাগটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সেজন্য প্রথমেই সে পা ধুয়ে হ্যাণ্ডব্যাগটি নিয়ে সামনের ঘরে গিয়ে উঠল।

কলকাতার বাবু, সুতরাং উৎকণ্ঠা এবং আড়ষ্টতা ছিল আশেপাশে। সামনে কেউ আসছে না বটে, কিন্তু অন্ধকারে বহুকণ্ঠের ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। একটু পরে ভিতরে এসে

দাঁড়াল যুম্‌নি। সুশীল এবার ব্যাগটি খুলল। সন্দেশের মোড়কটি সামনেই ছিল এবং অনেকগুলিই আছে তার মধ্যে। সেটি বার করে সে বললে, আর কেন, এগুলো ওদেব সবাইকে ভাগ করে দাওগে।

ব্যাগের ভিতরে একটা কালো রংয়ের কৌটো দেখে যুম্‌নি মৃদুগলায় হঠাৎ প্রশ্ন করল, ওর মধ্যে কি আছে?

সুশীল বললে, ওতে ঠাকুমার জিনিস আছে। আমার একটি ছেলে হয়েছে, ঠাকুমা তাই তাঁর নাতবৌকে কিছু গয়না পাঠিয়েছেন।

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল যুম্‌নির। বললে, দেখি না?

মেয়েটাকে অবিশ্বাস করার কোনো কাবণ নেই। সুশীল সেই কৌটো খুলল। ওর মধ্যে রয়েছে গলাব, কানের, আর হাতের গহনা। যুম্‌নি বললে, আমাকে দাও, পরি—আবার দিয়ে দেব।

প্রতিবাদ কিছুমাত্র জানাবাব আগে যুমনি গয়নাগুলো নিয়ে পরতে লাগল। অবাকবিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে রইল সুশীল। অতঃপর গয়না পরে সন্দেশের মোড়কটি নিয়ে যুম্‌নি উঠে বাইরে চলে গেল, এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

ডাল ভাত লাউঘন্ট ডিম সিদ্ধ—আর চাই কি। একটি চাষী-পরিবারের ঘরে এই তো রাজভোগ। পরিতৃপ্তি সহকারে

আহার শেষ করে সুশীল হাত ধুয়ে ঘরে উঠল। স্পষ্টকথা সুশীল কিছু বলছে না, এটি যুমনির নিষেধ। সমস্ত ব্যাপারটা আগোগোড়া প্রতারণায় ভরা, সুতরাং সুশীল যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করে ছিল। মোড়ল এসে ভয়ে ভয়ে গল্পসল্প করে গেল, কিন্তু এমন করে যুম্‌নি তার নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে যে, কোনটাই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া গেল না! যুম্‌নি তার লোকসমাজের মধ্যে বসে বহু সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী বলে গেল। তার ইজ্জত, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, তার আশ্চর্য সৌভাগ্য— সমস্তটাই বিস্ময়কর। তার লজ্জাশীলতা, শোভন ভদ্র আচরণ, তার গদগদ কণ্ঠের কাকলী, হাসিখুশি মুখ, বাঁকাচোখের কৌতুক চাহনি, তার মূল্যবান পরিচ্ছদ এবং স্বর্ণালঙ্কারের বিচিত্র কাহিনী,—এ সমস্তই মধ্যরাত্রি অবধি জনসমাজকে অভিভূত ও মুগ্ধ করে রাখল। শুধু একটি বিচিত্র রাত্রি তার সম্মুখে—তার সমগ্র দুঃশীল দুর্গত ও দুর্নৈতিক জীবনের সকল গুপ্ত বাসনা একটি মাত্র রাত্রিতে সংহত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। এ মেয়ে সেই সারাদিনের পথচারিণী দরিদ্রা দুশ্চরিত্রা সমাজ-পরিত্যক্তা মেয়ে নয়,—এ অন্য মেয়ে।

যুম্‌নির কলঙ্ক হেঁটে বেড়িয়েছে চিরকাল এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। সুতরাং আজ তার নূতন সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করে নিতে লোকসমাজের অনেকটা সময় লাগল! হয়তো-বা রাত দুটোই বাজতে চলল। ফুঁ দিয়ে-দিয়ে যেমন আগুন জিইয়ে রাখে, তেমনি করে যুম্‌নি তার নতুন-নতুন গল্প ফেঁদে সবাইকে জাগিয়ে

রাখল। অবশেষে একে একে সকলকে বিদায় দিয়ে একসময় হারিকেনটি নিয়ে সে ঘরে এসে ঢুকল এবং দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

আলোটা কমানো ছিল,—কমানোই রইল। আন্দাজে সে বুঝল, অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে সুশীল কখন যেন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতি সন্তর্পণে যুম্‌নি ছোট জানলাটা খুলে দিল। হ্যাণ্ডব্যাগটি ছিল সামনে। যুম্‌নি আস্তে আস্তে সেটি খুলল, এবং সেই কৌটোটি বার করে গায়ের গয়নাগুলি নিয়ে একে একে তার ভিতর গুছিয়ে রাখল। অতঃপর তার নিজের যে ছিন্নভিন্ন ও ময়লা কাপড়খানা এতক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে নিয়েছিল, সেইখানা দিয়ে সে সুশীলের জুতো জোড়াটা পরিষ্কার করে মুছল। তারপর সব কাজ একে একে সারতে অনেকটা সময় গেল বৈকি।

এক সময় সে উঠল এবং দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে দিল। ভিতরে হাওয়া আসুক, নিদ্রিত রাজকুমারেব কপালে ঘামের ফোঁটা না জমে ওঠে। না, ভিতরে-বাইরে এখন আর কেউ জেগে নেই। কিন্তু আজকের এই নিশুতি রাত্রে যুম্‌নি আর লোভ সামলাতে পারল না। হারিকেনটা সামান্য একটু বাড়িয়ে সে তক্তার ধারে এসে সুশীলের মাথার দিকে দাঁড়াল। দেখলো ভাল করে তরুণ যুবককে। এতকাল ধরে অনেক পুরুষমানুষকে সে দেখে এসেছে, —কিন্তু সারাদিন যাবৎ একান্ত কাছে-কাছে থেকেও যে ব্যক্তির দিকে মুখ তুলে সে একটিবারও ভালো করে তাকায় নি, এখন তার ঘুমন্ত মুখখানা যুম্‌নি ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

না, এ ভিন্ন ব্যক্তি। এ পুরুষ যুম্‌নির পরিচিত সংসারের থেকে পৃথক। একে সে আগে কখনও দেখে নি। সবাই মিলে তাকে বলেছে পরম সৌভাগ্যবতী। কিন্তু সে মিথ্যে। একান্ত প্রতারণা। ভয়ানক ফাঁকি। দেখতে দেখতে নিজের প্রতি তার একটা আক্রোশ ধকধক করতে লাগল এবং কালবৈশাখীর মতোই যুম্‌নির বাঁকা চাহনি একবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তারপর দেখতে দেখতেই তার সেই রুক্ষ রক্তিম দৃষ্টির ভিতর থেকে ঝরঝরিয়ে জল নেমে সৃষ্টি-স্থিতি সৌরবিশ্ব প্লাবিত ও একাকার করে দিল।

যুম্‌নি কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বলা যায় না। একসময়ে আলোটা নিয়ে সে বাইরে এসে দাওয়ার ধারে বসল এবং বারংবার তার অবাধ্য চোখ দুটো মুছতে লাগল। রাত সাঁ-সাঁ করছিল।

যুম্‌নি জানে, আকাশের শেষরাত্রির লক্ষণ কখন প্রকাশ পায়। একসময় সে উঠল। তারপর ঘরে ঢুকে চৌকির কাছে গিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকল, বাবু—ওগো বাবু—এবার উঠে পড়ো। এখনই বেরোতে হবে। রাত আর বাকি নেই। তৈরী হয়ে নাও।

সুশীল ঘুম চোখে ধড়মড়িয়ে উঠল। চোখ রগড়ে বললে, হ্যাঁ, যেতে হবে! চলো,—কিন্তু বড্ড গা ব্যথা,—তা যেতে হবে বৈকি!

তাড়াতাড়ি উঠে জামাটা গায়ে চড়িয়ে সুশীল বললে, এখনও যে অন্ধকার রয়েছে, যুম্‌নি! পথ দেখতে পাব তো?

যুম্‌নি বললে, হ্যাঁ পাবে। আমিও যে যাব সঙ্গে, পৌঁছে দেব। এখনই ভোর হবে, ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় চলে যাবে। তোমার সব গয়না রেখে দিয়েছি কৌটোয়। দেখে মিলিয়ে নাও।—হ্যাঁ, আরেকটা কথা। গোটা চারেক টাকা আমার হাতে দাও তো? ওদের দিয়ে যাব। তুমি খরচ করতেই তো বেরিয়েছ, পরের ভাত খাবে কেন? ওতে তোমার আর আমার দুজনেরই মান বাঁচবে।

দ্রুতহস্তে সুশীল চারটি টাকা বার করে দিল। সেই টাকা নিয়ে যুম্‌নি ছুট্টে গেল দাওয়া থেকে নেমে আরেকখানা ঘরে। একটি ঘুমন্ত বৌকে মেঝের উপর থেকে টেনে জাগিয়ে তুলল। তারপর তার হাতে চারটি টাকা দিয়ে বললে, আমরা এবার যাচ্ছি রে। মোড়ল উঠলে টাকাটা ওর হাতে দিস, ভাই—

বৌটা বাইরে এসে দাঁড়াল। ব্যাগটি হাতে নিয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে সুশীল বেরিয়ে এল। হারিকেনটা টিপটিপ করছে। যুম্‌নি ওই বৌটির কাছে হাসিমুখে বিদায় নিল, এবং মাথায় একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে সুশীলের দিকে ফিরে বললে, এসো—

দুজনে হনহনিয়ে চলল কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে হাটতলা পেরিয়ে অনেক দূর। অন্ধকার গ্রামটি পিছনে ফেলে দুজনে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বৌটি দাঁড়িয়ে রইল একদৃষ্টে ওদের পথের দিকে তাকিয়ে। আকাশ ধীরে ধীরে ফরসা হল। ঊষাকাল এসে দাঁড়াল। অতঃপর দেখতে দেখতে লোকজন এসে আবার ভিড় করল গতরাত্রির কাহিনী শোনার জন্য।

যত বেলা বাড়ে ততই চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যায়। যুম্‌নিকে সবাই চেনে। সেই কারণে অপরিসীম কৌতূহল সকলের মুখে চোখে। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেছে সবাই, কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতে বাধে।

কিন্তু যাদের নিয়ে এত হৈ-চৈ তারা তখন চলে গেছে অনেক দূর পথ। বেলা আটটার মধ্যে তারা মাইল পাঁচেক পথ পেরিয়ে প্রায় শাম্‌তার কাছাকাছি এসে গেছে। নদীর ঘাট দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শাম্‌তার সেই বিশাল বটবৃক্ষের বনস্পতি। দূরে কাছারির চালাঘরের করোগেটে রোদ পড়ে চকচক করছে। শিব-মন্দিরের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে চৌধুরীদের মস্ত বাড়ির একাংশ।

সুশীল এবার দ্রুতপদে চলেছে! ঘাটে পা ধুয়ে সে জুতো পরবে, চিরুনি বার করে মাথাটা আঁচড়ে নেবে। কাছা-কোঁচাটাও শ্বশুরবাড়ির উপযুক্ত করে গুছিয়ে পরবে।

যুম্‌নি পিছু পিছু আসছে। এবার তার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। চৌধুরীদের বাড়িখানা ভালো করে দেখিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে নিজের পথে। যাবে সে ধানকলে কাজ নেবার জন্য।

বাঁশবাগানটা পেরিয়ে সুশীল একবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। তার মন খারাপ লাগছে। অন্তত গোটা দশেক টাকা যুম্‌নির হাতে গছিয়ে দিতে না পারলে তার স্বস্তি হচ্ছে না। পথের অসুবিধা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনই হোক, মেয়েটা তাকে নিরাপদে এনে পৌঁছিয়ে দিল, এর কৃতজ্ঞতা কম নয়।

যুম্‌নি বোধকরি অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, বনবাগান ছাড়িয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে না। সুশীল সেখানেই অপেক্ষা করে রইল। আর কিছু নয়, শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গত চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনী সবিস্তারে সে বলবে বটে, তবে গতরাত্রির গল্পটা যথাযথ-ভাবে বলা সঙ্গত হবে কিনা সেটা বিবেচনার বিষয়।

হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল যুম্‌নি বাঁশবাগানের ভিতর থেকে। আড়ালে গিয়ে সে এতক্ষণে তার পরনের মূল্যবান শাড়ি আর রেশমী জামা ছেড়ে আগেকার সেই শতছিন্ন মলিন কাপড়খানা পরে নিয়েছে। এবার যেন তাকে কিছু প্রসন্ন মনে হচ্ছে।

ও কি করলে, যুম্‌নি?

হাসিমুখে যুম্‌নি বললে, দশ মিনিট সময় আমাকে দাও। ঘাট থেকে এ দুটো কেচে শুকিয়ে নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও। হাওয়ায়-রোদ্দুরে কাপড় জামা এখুনি শুকিয়ে যাবে।

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, সে কি কথা। লোভ তোমার কিছুতে নেই জানি, কিন্তু ও-দুটো জামা কাপড় আমি আর ফেরত চাইনে, যুম্‌নি—ও তোমারই রইল।

তোমার বউয়ের জিনিস আমি নেবো কেন?

তুমি হাসালে, যুম্‌নি। ও যে নতুন জামা-কাপড়! তিনি তো এখনও চোখেই দেখেন নি! সুশীল এবার যেন একটু মিনতি জানিয়েই বললে, আমার একটা কথা রাখো, যুম্‌নি। তুমি কিছুই নিলে না, অথচ দুদিন ধরে আমার জন্যে এত কষ্ট করে

গেলে, এ যখনই ভাবব, আমার বড্ড মন খারাপ হবে। ওই সঙ্গে গোটা দশেক টাকাও তুমি রেখে দাও, যুম্‌নি। তোমার কাজে লেগে যাবে।

একটা চাপা রুক্ষতা আবার এসে পড়ল যুম্‌নির দৃষ্টিতে। সে-চক্ষু প্রখর সন্দেহ নেই। ফস্‌ ক'রে ঈষৎ কর্কশকণ্ঠেই সে বললে, টাকা দিয়ে বুঝি আমার দুঃখু ঘোচাতে চাও? বড়লোকেরা বড্ড টাকা দেখায়।

সুশীল একটু চমকে চুপ করে গেল। বললে, আচ্ছা—আচ্ছা যাক্‌। আমারই ভুল হয়েছে! কিছু মনে কোরো না, যুম্‌নি।

যুম্‌নি বললে, বেশ, তুমি যখন বললে এত করে,—এ দুটো আমি নিয়েই যাচ্ছি। ওই যে চৌধুরীদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে! গাজনতলাটা ঘুরে গেলেই রাস্তা পাবে। এদিক দিয়ে যাও।

হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। আসি তবে। তোমার কাছে অনেক ঋণ আমার রইল, যুম্‌নি।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুশীল অগ্রসর হল। পিছন ফিরে তাকাতে কি জানি কেন তার আর সাহস হল না। পথের বাঁক ফিরে সে হনহন করে চলে গেল।

যুম্‌নি বসল সেইখানে। নতুন কাপড় আর জামা নিয়ে সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে লাগল। মুখেচোখে তার খুশি অথবা আনন্দের আভাসমাত্রও ছিল না। বরং বিরক্তি অশ্রদ্ধা ও আক্রোশে তার মুখের চেহারাটা কঠিন হয়ে রইল।

*   *   *

জামাই এসেছে ঘরে—দিন তিনেক ধরে চৌধুরীবাড়িতে আনন্দের সীমা ছিল না। চতুর্থ দিনে সবাইকে নিরানন্দে ভাসিয়ে কন্যা ও জামাতা বাবাজী নৌকায় উঠল। সঙ্গে চলল ছ-মাসের কচি শিশুপুত্র, দুজন ঝি-চাকর, একজন চাপরাশি ও সরকারমশাই। সালঙ্কারা সুবেশা বধূ স্বামীর সঙ্গে চলল শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়।

শামৃতা গ্রাম ভেঙে পড়েছিল ঘাটে।

নৌকা চলল ঘাট পেরিয়ে আঘাটার পাশ দিয়ে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে ওই আঘাটার পাশেও লোক জমায়েত হয়েছিল। তবে সেটা অন্য কারণে।

সরকারমশাই বললেন, ওদিকে তাকাবেন না জামাইবাবু, ওতে দিদিমণির অকল্যাণ হবে। ও একটা দুর্ঘটনা।

সুশীল প্রশ্ন করল, কি হয়েছে ওখানে?

কে একটা মেয়ে ডুবে মরেছে কাল ঝড়বৃষ্টির সময় সন্ধ্যেবেলা। কাদের মেয়ে কেউ জানে না। তবে পরনে দামী শাড়ি আর গায়ে রেশমী জামা ছিল। কিন্তু শেয়াল আর কিছু রাখে নি। মুখ-চোখ-গা সব খুবলে খেয়েছে! দুর্গা দুর্গা—

সুশীলের মুখ দিয়ে কোনো কথা ফুটল না।—যুম্‌নি বোধহয় জানত, তিন দিন পরে এই নদীপথ দিয়েই ভাটির টানে সুশীলের নৌকা যাবে।

ঝড়ের হাওয়া উঠেছিল দামোদরে। আকাশজোড়া কালোমেঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে সকাল থেকে। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি চলছে বহুক্ষণ অবধি, কিন্তু বিপুল কালো মেঘের তুলনায় মুষলধারা এখনও নামে নি।

জেলেডিঙ্গি নিয়ে নদীতে নেমে যাবার বোধ হয় এইটিই উপযুক্ত সময়। বুড়ো জলু মাহাতো ভুল করে নি।

কিন্তু নাতনীটাকে এ বেলায় ডিঙ্গিতে উঠিয়ে জলু একটু আড়ষ্ট বোধ করছিল। ভরা বর্ষায় মেয়েটার গায়ে এমন করে বৃষ্টির জল বসাটা ভালো হচ্ছে না। গায়ের জামাটা সপসপ করছে। মেয়েটার জ্বর ছেড়েছে চারদিন আগে।

জলু বললে, বোধ হয় ঝড় উঠবে রে বুনি, তুই সামাল দে। জালের খোঁটা টেনে ধর, হাল ধরতে লারবি তুই।

বুনি চেঁচিয়ে উঠল, পারব পারব, তুই চেঁচাস নে। চেয়ে দেখ্, বাটামাছ উঠেছে তিনটে, একটা ছোট কাতলা। আড়াই টাকা দরে তুই পারবি নে বেচতে ? পুল-সায়েবরা হাটে আসবে দেখিস।

জলুর কানে কথাটা গেল। কিন্তু মেঘের চেহারা সে জানে, ঝড়ের লক্ষণটাও সে বোঝে। সুতরাং এক পা বাড়িয়ে সে ওই

অজ্ঞান মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়াল। দরকার হবামাত্র হালটাকে সে ধরবে। ওদিকে ডিঙ্গি মাঝে মাঝে টাল খাচ্ছে। জালটা একটু ভারী বৈকি। মাছসুদ্ধ টানতে গেলে ওরই মধ্যে আবার একটু কাত হয়।

বাতাসের মেজাজটা অনুভব করে বুড়ো আস্তে আস্তে জালটা গুটিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তখনই একবার ঝাপটা দিল বায়ুর বেগটা। দূর নদীতে বৃষ্টি এবার এসেছে বেশ জোরে। বুড়ো সেদিকে একবার তার পীত-কপিশ চোখ দুটো তুলে তাকাল, তারপর বললে, ধর বুনি, তুই জালের খোঁটা। এই বলে মেয়েটার হাত থেকে হালটা সে ছাড়িয়ে নিল। এবেলা এখন এই পর্যন্তই থাক, মেয়েটাকে রোজ জলে ভেজানো আর চলবে না।

বুনির চুলের ঝুঁটি থেকে জল পড়ছে। ঘাঘরাটাও ভিজে গেছে। কিন্তু ওই পাতলা চেহারায় তার ইস্পাতের কাঠিন্য ছিল। পাটাতনের মধ্যে নিজের পা দুটো আট্‌কিয়ে বুনি সেই টলমলে ডিঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে দুই হাতে সেই জাল টেনে গোটাতে লাগল।

ঝড় উঠেছে তখন দামোদরে।—

জলু বললে, সাবাস রে বুনি। হাঁ, এতেই হবে। আরেকটা কাতলা উঠল রে। লিবে বলছিস পুল-সায়েবরা? আড়াই টাকা দরে ছাড়তে লারব।—হাঁ হাঁ খবরদার,—ইয়া, ধর্‌ আমার হাতখান। এখানে ঘুন্নি আছে রে বটে।

আরেকটু হলেই বুনির পা ফস্‌কে গিয়েছিল আর কি।

ততক্ষণে ঝড় এসেছে এগিয়ে। শক্ত হাতে হাল বাগিয়ে জলু ঠিকমতো নৌকা নিয়ে চলেছে। ঘাট আসতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু দামোদর নাকি বড়ই খামখেয়ালী। কখন যে কোথায় ফুঁসিয়ে উঠবে, এই বৃদ্ধ বয়স অবধি জলু তার নির্দিষ্ট হদিস পেল না।

বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি এবার একটু জোরে এল। জালটা সম্পূর্ণ গুটিয়ে তুলতে বুনিকে অনেক কসরত এবং মেহন্নত করতে হল। এবার নিঃশ্বাস নিয়ে কপাল থেকে বৃষ্টিভেজা চুলের গোছা সরিয়ে সে হাসি-মুখে বললে, বুড়োদা, তুই যে বললি এবার রেশমী ঘাঘরা কিনে দিবি ?

জলু তার হালে টান দিয়ে বললে, হ, জাল ছুঁয়ে দিব্বি, ঘাঘরা এবার লয় !

কেনে ?

চল্ আগে ঘাটে গিয়ে উঠি। এবার শাড়ি রে শাড়ি, ঘাঘরা লয়,—বুকে যে তুর ফুল ফুটেছে ! এবার শাড়ি পরবি কোমর বেন্ধে।

জলু প্রাণের আনন্দেই হাসতে লাগল। বুনি তেমন কিছু বুঝল না। এক সময় শুধু বললে, মর্ তো ! আবার হাসছে দেখো কেনে।

পুল-সায়েবদের কতগুলো হোমরা-চোমরা লোক ওদের চালাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকৌতুকে জেলে ডিঙ্গিখানাকে লক্ষ্য করছিল। বাচ্চা একটা মেয়ের এই দুঃসাহসিক কৃতিত্ব

দেখে একটু অবাকই হতে হয়। ডিঙ্গি এসে ঘাটে লাগতেই একজন সাহেব চেঁচিয়ে বললে, এত সাহস কেন হে? মেয়েটাকে ডুবিয়ে মারবে নাকি?

বুড়ো জলু একবার শুধু তাকাল, কিন্তু কিছু বললে না। ওই বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে সুস্থে নাতনী আর ঠাকুরদা মিলে ঘাটে ডিঙ্গি লাগিয়ে জালটি তুলে নিল। তারপর দড়ি বার করে অতি যত্নের সঙ্গে ডিঙ্গিখানা সামনের ডুমুরগাছের গোড়ায় বেঁধে বুড়ো বললে, জাল টেনে লিয়ে তুই ঘরে যা বুনি, সায়েবরা কি বলে শুনে আসি।

বুড়ো এগিয়ে গিয়ে করোগেটের চালার কাছে এসে দাঁড়াল এবং মুখে তুলে ওদেরকে ডাকল, কি বলছ?

জনৈক সাহেব এগিয়ে এসে বললে, তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলাম হে। মেয়েটা জলের মধ্যে ছিট্‌কে পড়লে আমাদেরই লোক লাগাতে হত।

বুড়ো জলু মাহাতোর দৃষ্টি এমনিই কিছু রুক্ষ। হলদে ছুটো চোখের ড্যালা বড় বড়, মুখখানা কাঠিন্যে ভরা। এর ওপর যদি কিছু মানসিক উত্তেজনা জন্মে, তবে সেই মুখে চেহারায় বিপ্লবের চিহ্ন ফুটে ওঠে। জলু ওদের দিকে চেয়ে বললে, থামো। সাঁকো বাঁধতে এসেছ তাই বাঁধো, কলকারখানা বসাবে বসাওগে। জলের কি জান তোমরা? তোমাদের মতন সায়েবকে চুলের ঝুঁটিতে বেন্‌ধে ওই বাচ্চা মেয়ে সাতবার গাঙ পার হতে পারে, তা জানো বটে?

লোকটার এই প্রখর মেজাজের জন্য ওরা প্রস্তুত ছিল না। মেজর ফতে সিং এগিয়ে এলেন। বললেন, হুঁ, তোমাকে চিনি। তুমিই না সরকারী জমির সীমানা থেকে পিল্‌পে তুলে ফেলেছিলে?

পাশ থেকে একজন সহকারী বললেন, হ্যাঁ স্যর, এই সেই হুঁদে লোকটা। নাম জলু মাহাতো।

মেজর সিং একটু সতর্ক করে দিয়ে বললেন, জলু, তুমি হুঁশিয়ার থেকো।

জলু এবার ফেটে পড়ল, হুঁশিয়ার তোমরা থেকো, সায়েব। আমার জমি, আমার ঘাট,—ওখানে পিল্‌পে দেবার কে তোমরা?

হাসিমুখে অপর এক সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ক্যা, সরকারী কাম নহি হোগা, ভাই সাব?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জলু বৃষ্টিতে ভিজছিল। এবার বললে, সরকারী কাজ, তা আমার কি? বাপ-পিতমোর জমিনে খুঁটি গাড়া আছে, তোমরা সরাবার কে বটে?

জলুর চোখের ভিতরকার স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করে সাহেবরা হাসছিল। আপ্পারাও সাহেব হাসিমুখে ইংরেজিতে শুধু বললেন, আমাদেরই দোষ, ওদের এখনও বোঝাতে পারি নি, ওদেরই সুবিধের জন্যে ব্রীজ তৈরি হচ্ছে।

চৌধুরী সাহেব একটু গলা বাড়িয়ে বললেম, ওহে মোড়ল, ঘরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডা হওগে। বৃষ্টি ভিজে আর তোমাদের মাছ

ধরতে হবে না নদীতে। ঢালাই লোহার কারখানা বসলে তোমাদেরই সব ভালো-ভালো কাজ জুটবে।

জলু মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। বললে, লম্বা-চওড়া কথা! তুমাদের কাজ, আমার কাজ—এক লয়। জমিন আমি দিব না।

হেসে উঠল সাহেবরা। বললে, তুমি দেবে কেন হে? ওটা যে দখল করা হবে! তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে।

জলু গ্রাহ্যও করল না। কেবল তার সেই উগ্র দুটো চোখ তুলে বললে, হুঁ, ডাকাতি! ডাকাতি করে লিবে, লয়? আমারও খ্যামোতা আছে, আমিও দেখে লিব।

মুখ ফিরিয়ে জলু তার ঘরের দিকে চলে গেল। বুড়ো কোনও যুক্তি মানে না, ভবিষ্যৎকালের সৌভাগ্য বোঝে না, নিজেদের দুর্গতি মোচনের নক্সাটাও কানে তোলে না। সাহেবরা ওই অ্যাস্‌বেস্‌টসের বারান্দার ধাবে দাঁড়িয়ে দামোদরের জলের শোভা দেখতে দেখতে নানাবিধ কল্যাণজনক আলোচনা করতে লাগল।

জলু ফিরে এল তার নিজের ঘবে।' চালাঘরের অবস্থাটা এ বছর আব তেমন ভালো নয়। কাঠা দশেক জায়গা তার এখনও আছে। এর বাইরে যা কিছু সবই গেছে সায়েববাগানের এলাকায়। কোথা থেকে যেন বিপুল পরিমাণ লোহালক্কড় এসে পড়েছে চারদিকে। রাতারাতি বসে গেছে কুলিব্যারাক আর বড় বড় সাহেবী বাংলা। ইলেক্‌ট্রিকের মেসিন থেকে এক রকমের আলো আর আগুন ফোটে,—সমস্ত রাত ধরে

অন্ধকার আকাশ যেন ফুটফুট করে। গ্রাম ছিল এদিকে সাতখানা,—কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রাম কোথায় যেন রাতারাতি হারিয়ে গেল।

দাওয়ায় উঠে এসে গামছা দিয়ে জলু গা-মাথা মুছছিল। বাইরে থেকে কাঠকুটো যোগাড় করে বুনি তখন আগুন ধরাবার চেষ্টা পাচ্ছে। জলু একবার সেদিকে তাকাল। ওই বাচ্চা মেয়েটার জন্যই তার যা কিছু বাঁধন, নৈলে সে আর কিছু পরোয়া করে না। দীনু বাগদিরা চলে গেছে, হারু কামার পালিয়েছে, নক্শীর দাশু ময়রা ঘরদোর বেচে নাউমুণ্ডির দিকে ঘর বেঁধেছে, —একে একে সকলেই পথ দেখেছে। চারিদিকে এখন লোহালক্কড়ের শব্দ, ইঞ্জিনের আগুন, মোটর গাড়ির আনাগোনা, সাহেবসুবোর ভিড়। এই বিপুল কর্মসমুদ্রের মধ্যে জলু ধরে রেখেছে তার জমিটুকু।

নিজের হাতে একটু তামাক ধরিয়ে সবেমাত্র সে বসেছে, ওধার থেকে বুনি বললে, লক্ড়ি আর নাই রে বুড়োদা, ভাত ফুটবে না।

সবুর কর, এনে দিচ্ছি।

বুনি ভিজে কাঠের ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচিয়ে সরে এসে বললে, মাছ লিয়ে হাটে যাবি নে?

তামাকে টান দিয়ে জলু তীব্রকণ্ঠে বললে, ওই শালারা খাবে আমার ধরা মাছ বটে! যা তুই, গাঙে ফেলে দিয়ে আয়। মাছ আমি বেচব না।

বুনি বললে, মাথা খারাপ হইছে তুর। আবার বুঝি ওই পুল-সায়েবদের সঙ্গে ঝগড়া করে এলি?

জলুর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে এল। বললে, আমার জমিন্ কেড়ে নিয়ে উরা আমায় তাড়াতে চায়, এ অবিচার সইব কেনে রে? মরি ত বটে, মেরেই মরব!

বুনি রাগ করে বললে, তুই মার খাবি, মারতে পারবি লয়। তার চেয়ে তুই অলাউঠায় মর্।

মুখের ধোঁয়া ছেড়ে জলু এবার হাসল। বললে, আমি মলে তোরে শাড়ি দেবে কে? কে বিয়া করবে তুরে?

বুনি দাঁত কেটে জবাব দিল,—দেখিস্ কেনে, পুল-সায়েবের ঘরে গিয়ে উঠব। তুই মর্ আগে।

তামাকে বেশ বড় বড় টান দিয়ে বুড়ো উঠল এক সময়ে হাসিমুখে। পরে বললে, প্রাণ থাকতে তা লারবে রে, ছুঁড়ি। দে, মাছ বার করে, হাটে যাই।

মাছের চুপড়িটি বুনি সামনে এনে দিল। কাঠের ধোঁয়ার দিকে একবাব তাকিয়ে জলু বললে, শালারা সব তল্লাটের গাছ কেটে সাফ করেছে রে। কাঠ আর পাবি নে, এখন সব কয়লা। তুই ফুঁ দে ততক্ষণ, আমি আসছি।

মাছের চুপড়ি নিয়ে জলু কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে গেল। ছপোয়া রাস্তা গেলে সরকারী বাজার বসেছে। জলু সেইদিকে চলল।

দিন তিনেক পরে ডিঙ্গিখানা ঘাটের এক পাশে বেঁধে জলু তার জালটি কাঁধে নিয়ে যখন এসে তার চালায় ঢুকছে, দেখে সেই চাপরাসিটার সঙ্গে বুনির কি যেন কথা কাটাকাটি চলছে।

জলু এসে দাঁড়াল পাশে,—হইছে কি শুনি?

তারণ সিংয়ের বগলে একটা লাঠি। সে তার বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের চাপড় মেরে খৈনিটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, চালান্ এসেছে, চালান্। তুহার নাত্তিন্ হামার সঙ্গে তক্‌রার লাগিয়েছে রে, জলু। আরে, হামি তো সরকারী নোকর আছে, না কি?

জলু শান্ত কণ্ঠে বললে, কিসের চালান?

সেই যে সেবারে লট্‌কাইয়া গেলম রে ভাই,--হাকিম সাহেব তোরে ডাকিয়ে পাঠাল, তুই যাইলি না—

হাঁ মনে আছে।

সেই কোথাই বলছিলম তোহার নাতিনরে—

জলু প্রশ্ন করল, আজ আবার এসেছো কেনে?

তারণ সিং জবাব দিল, হামি তো ষাট টাকা তলবের নোকর আছি কি নেই? হামার কসুর তো কুছ না রে ভাই, জলু। নুটিস্ লট্‌কাইয়ে হামি চলে যাব। এ তো ভাই সরকারী হুকুম।

কাঁধের জালটা জলু নামাল। ভিতরে মাছ রয়েছে কয়েকটা। বুনি সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভিতরে। জলু তার কাঁধের গামছায় মুখ মাথা আর গা-হাত মুছে বললে, কি আছে তুর নোটিসে?

লাঠিটা বগল থেকে নামিয়ে তারণ সিং বললে, এ তো সোবাই জানে জলু। ছনিয়াভর সব জমিন্ যাবে সরকারী দখলে। এখানে থেকে সাত মাইল ধরে টাউন বসিয়ে যাবে। তোকে লুটিস্ দিছে হাকিম সাহেব। এ জমিন্ ছাড়িয়ে যেতে হবে।

কই দে দেখি নোটিশ।—জলু হাত বাড়াল।

তারণ সিং এবার খুশী হয়ে তার কোর্তার পকেট থেকে খান-ছুই কাগজ আর একটি কালির প্যাড বার করল। পরে বললে, এই কাগজে একঠো টিপসই মেরে লুটিস্‌টা লিয়ে লে, জলু। হামাদের কাম বড় খারাপ আছে, ভাই। মানুষকে তার আপ্‌না জমিনসে তাড়াতে ছাতিতে লাগে।

অত কথা শোনার সময় বুড়ো জলুর নেই। সে বললে, দে তুই—এই বলেই নিজেই তারণ সিংয়ের হাত থেকে কাগজ ছখানা নিয়ে তৎক্ষণাৎ কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

হাঁ হাঁ, জলু, কি করিস,—আরে কম্‌বক্‌ত, তোর সাজা হয়ে যাবে। ফাটকে টেনে নিয়ে যাবে দেখিস।—তারণ সিং অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

যা ভাগ্ এখান থেকে।—জলু তার কঠিন কর্কশ চক্ষু তুলে তাকাল।

হাঁ যাচ্ছি—তারণ সিং তার লাঠি ঠুকল। বললে, লেকিন জানিয়ে যাচ্ছি তোর গেরেপ্তারি পরোয়ানা আসবে এবার।

ফের বকোয়াসি করছিস বটে!—জলু তার লাঠিখানা কেড়ে নিতে গেল, এমন সময় বুনি ছুটে এসে জলুকে ধরে ফেলল।

তারণ সিংয়ের দিকে ফিরে সে বললে, যাওনা কেঁনে এখান থেকে ? মারধর খাবে বটে ?

তারণ উগ্রকণ্ঠে বললে, সরকারী নোকরকে মারবে কোন্ শা—

তবে রে—জলু আবার ছুটে আসছিল।

তারণ সিং বললে, বেশ, হামি যাচ্ছি। সরকারী নোকর কভি গুণ্ডাবাজি করে না। তোকে তামাশা দেখিয়ে দেবো হামি !

বলতে বলতে তারণ সিং চলে গেল। ওপাশে দাঁড়িয়ে জলু বুড়ো যেন বিপ্লবের বহ্নিতে ধকধক করে জ্বলছিল। হল্‌দে ছুটো চোখ হয়ে উঠেছে রাঙ্গা। কিন্তু তার কণ্ঠের লোলচর্মের ভিতর থেকে মোটা মোটা শিরাগুলোকে ফুলে উঠতে দেখেই বুনি উদ্বিগ্ন বোধ করে বললে, হেই বটে, এবার কাসি উঠছে তোর। মরণ নাই কেনে, মরে যা তুই ! চল্ তুকে গাঙে ভাসিয়া দিই।

কিন্তু বুনির কথা শেষ হল না। আজ প্রায় পনেরো দিন বাদে জলুর বুকের ভিতর থেকে আবার সেই পুরনো কাসির বেগ উঠল। প্রথমটা চাড়া দিল গলায়, তারপর দম আটকাল, তারপর যেন কোন অতল তল থেকে একটা ভয়ানক কাসি উঠে এল। কাসতে একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। আপন ধাক্কাতেই আপন বেগ সৃষ্টি করে। বুনি তাকে রেখে ভিতরে ছুটল, এবং তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল। সেই জল সে ঢালল জলুর মাথায়,—জলুর প্রবল কাসি তখনও থামে নি। কিন্তু কাসতে কাসতে মুখের ভিতর থেকে যখন মোটা মোটা রক্তের ছিটে বেরোতে লাগল, তখন আশ্বস্ত হল বুনি।

যাক্, এবার কাসি থামবে। রক্ত বেরিয়ে এসেছে, আর ভয় নেই।

ঠিক তাই হল। আগে ছিটে ছিটে রক্ত, তারপর খানিকটা গলগলিয়ে। অতঃপর কণ্ঠের নালিপথটা যখন রক্তে পিছল হয়ে এল, কাসি তখন থামল। বাঁচল জলু। প্রায় সাত বছর থেকে এই কাসি তাকে ধরেছে। এবার স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে মুখখানা ধুয়ে সে উঠে ভিতরে গেল।

ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে এসে মাছ কুটতে কুটতে বুনি বললে, কি ভাবছি জানিস ?

জলু একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললে, কি বটে ?

তুকে লিয়ে আব ঘর করতে লারব।

কেনে ?

খুনে লোক তুই। ঝগড়া করবি, মারতে যাবি সবাইকে — তুকে যদি চালান্ দেয় আমি কি করব ?

হাসিমুখে জলু বললে, তখন তুই গিয়ে পুল-সাহেবের ঘরে উঠবি ?

মাছ ছেড়ে বুনি উঠে এল। দুই হাতে তার ইলিশ মাছের গন্ধ। কিন্তু সেই হাতেই সে বৃদ্ধ জলুর গলা জড়িয়ে বললে, উ কথা বুলতে নাই, বুড়োদা। তোর চান্দামুখের কাছে কেউ লয়।

পীত-কপিশ চক্ষু যেন কোন্ নিবিড় আনন্দে বুজে এল। হয়তো এখনি জল গড়াবে। কিন্তু তা নয়। নাতনীকে এক হাতে

কাঁধে তুলে নিয়ে জলু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল্, আজই তুর জন্যে শাড়ি কিনে আনি।

তুর মরণ বটে। ছাড়, ছেড়ে দে—নামি। যেতে হয় তুই যা। কান্ধে করে মাগি লয়ে যাবি, হাটের লোক কি বলবে?

বুনি জলুর কাঁধ থেকে নেমে আবার মাছ কুটতে বসল। জলু হাসিমুখে কি যেন একটা মতলব ঠাউরে তখনকার মতো বেরিয়ে গেল। দক্ষিণে কিছুক্ষণ আগে থেকে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। আজ মাছ উঠবে ভালো। ছুটি ভাত মুখে দিয়েই আজ ডিঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। জলু এসে তার খামারটিতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। পেঁপে গাছটায় এবার ফল ধরেছে অনেক। মাচানে কুমড়োটা আজও রয়েছে, পাক ধরেছে একপাশে। বেল এসেছে গাছে। কাঁচা লঙ্কা হয়েছে অনেক। বেড়াটা ভেঙে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। বর্ষার পরে এবার সে জমিনে বেড়া দেবে। ঘরখানা সেই যে চৈত্রের ঝড়ে কাত হয়ে পড়েছে, আজও তেমনি রয়েছে। কিন্তু হাটে আজকাল বাঁশ-খড়-কাঠকুটো - কোনটাই পাবার উপায় নেই। সব জিনিসই আসছে, কিন্তু ঠিকাদাররা সব কিনে নিচ্ছে চড়া দামে। সরষের তেল পাবার যো নেই। টাকায় পাঁচ পোয়া চাল।

মাথা উঁচু করলে এখান থেকেই দেখা যায়, দূরে ও কাছে চারিদিকে লোহার কারখানা আর যন্ত্রপাতির ডিপো। হাজার হাজার দানব এসে যেন গ্রামকে-গ্রাম চেটে নিচ্ছে, কোথাও

দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। নালা-ডোবা-পুকুর—সব বুজে মাঠ হয়ে গেছে। আম-কাঁঠালের বাগানগুলো মিলিয়ে গিয়ে মোটর গাড়ির শেড তৈরী হয়েছে। চেনা মুখ কোথাও আর দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু সাহেব-সুবো আর ঠিকদারদের দাপাদাপি। হপ্তায়-হপ্তায় নতুন নতুন কারখানা বসে যাচ্ছে।

কিন্তু জলুর এটা জিদ—সবাই বলবে। এখনই সরকারী প্রস্তাবে রাজী হলে তার কপাল ফিরে যায়। কয়েক মাইল দূরে বিঘা-দুই জায়গা তার নামে বরাদ্দ হয়। এক গাড়ি বাঁশ, পাঁচ কাহন খড়, নগদ একশ টাকা। কাপড় পাবে দু জোড়া, তার সঙ্গে আড়াই মণ চাল। ভাগ্যটা তার ফিরেই যায়। কিন্তু পাওনার কথাটা থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে গিয়েই তার মুখের চেহারা দেখতে দেখতে আবার রুক্ষ হয়ে এল। ঠিক এই মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে তাকে কেউ দেখলে ভয় পেয়ে সরে যেত। লোভের চেহারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলেই তার দুই চোখে হিংস্রতা ফুটে উঠল। সে কিছু চায় না,—জীবনটাকে সে শুধু কাটাতে চায়, যেমন সে কাটিয়ে এসেছে এতকাল। ওই নাতনীটাকে আরেকটু বড় করে সে বিয়ে দেবে, নাতজামাইকে এনে এই বাস্তুতে বসাবে। ঘরখানা তুলবে, খামারে সব্জি বানাবে, বাগানে বেড়া দেবে, নৌকা নিয়ে মাছ ধরবে,—ব্যস, আর কিছু সে চায় না।

তারণ সিং শাসিয়ে গেছে বার বার। হাকিমের নোটিশ এসেছে বারতিনেক। মেজর ফতে সিং, চৌধুরী সাহেব, আপ্পারাও,

—এরা সবাই সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু এদের কথায় কান দেবার সময় জলুর কোথায়? বুনির আবার জ্বর এসেছিল এর মধ্যে—সেটা সবেমাত্র ছেড়েছে। ডিঙ্গি নিয়ে বার-দুই দামোদরে না নামলে চলে না। ঘর আগলায় বুনি,—এমন কেউ চেনাশোনা নেই যে, অসময়ে এসে দাঁড়ায়। সম্প্রতি মাটি কাটবার লোকজন এসে ঘুরছে। ডুমুর গাছটার নীচের থেকে মাটিকাটা শুরু হবে, ওখানে মাটির গভীর নীচের থেকে সাঁকোর ভিত উঠবে। বালু, পাথরের ঢিল, মস্ত বড় ক্রেন্, নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, একে একে সমস্ত এসে জড়ো হচ্ছে। তাকে যেন অবরোধ করছে সবাই চারিদিক থেকে। বিপুল যন্ত্রদানব যেন তাকে বেষ্টন করছে এক সময় তার টুঁটি টিপে ধরবার জন্যে। দিবারাত্রি ধাক্কা পড়ছে তার ওই ঘরখানায়। ঘনঘোর ভবিষ্যতের দিকে জলু ভীষণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে।

* * *

একদিন দশ-বারোখানা ইটবোঝাই লরী এসে দাঁড়াল জলুর বেড়ার ঠিক পাশে। আনাগোনার পথটা যে বন্ধ হচ্ছে, সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এর ওপর আবার সে হঠাৎ একদিন দেখল, দড়ি খুলে কে যেন তার নৌকা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল, তিন-চারজন হিন্দুস্থানী লোক ডিঙ্গিখানা নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ আর হৈ-হল্লা করতে-করতে ফিরছে। জলু একেবারে অগ্নিশর্মা। ঘাটে এসে ডিঙ্গি লাগতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, এই হারামজাদারা, তোদের বাবার নৌকো?

ক্যা, গালি দেতা হ্যায় ? ঠহরো—

কিন্তু তার আগে পটাং করে জলু সামনের গাছ থেকে মোটা দেখে একগাছা ডাল ভেঙে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটাকে অন্তত সে আজ শেষ করবে। হৈ-চৈ পড়ে গেল এখানে ওখানে। পুল-সাহেবদের কেউ কেউ এসে দাঁড়াল। ঠিকাদাররা মিটমাটের জন্য এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিন্দুস্থানীরা বেগতিক দেখে সরে গেল। খবর রটল নানাদিকে—এখানে একজন দুর্ধর্ষ লোক নাকি বাস করে। এককালে সে নাকি ডাকাতদলের সর্দার ছিল। পুলিসের পুরনো খাতায় ওর নাম লেখা হয়েছে অনেকবার।

ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটমাট কবতে গিয়ে অনেককেই সেদিন বেগ পেতে হয়েছিল।

একদিন জলু সকালে উঠে দেখল, খামারে তার একটিও সব্জি নেই। কুমড়ো, পেঁপে, লঙ্কা, ডুমুর, কাঁচকলাব সেই কাঁদিটা, গোটা-চারেক কচি লাউডগা,—সমস্তই অদৃশ্য। কাঠকাটার কুড়ুলখানাও আজ দুদিন হয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আগাগোড়া সমস্ত নিছক চুরি!

সাংঘাতিক আক্রোশে ফুলতে ফুলতে জলু গিয়ে পুল-সাহেবদের বারান্দায় উঠল। আজ এস্পার-ওস্পার যা হয় একটা করতেই হবে।

সাহেব!

জন-দুই ভদ্রলোককে নিয়ে মেজর ফতে সিং টেবলে বসে

কাজ করছিলেন। বেলা তখন নটা। হাসিমুখে মেজর সিং বললেন, খবর কি, মাহাতো?

তোমার চোরকে যদি না সামলাও, একটাকে মেরে খুন করব!

চোর! কোথায় চোর!

জলুর চোখে আগুন ঠিকরে যাচ্ছিল। বললে, আমার খামারে ঢুকে সব সব্জি কেটে লিছে কে? এসব লষ্টামি আমি সইব না, সায়েব।

মেজর সিং বললেন, এখানে হাজারো আদমি আছে। তুমি চোর ধরিয়ে দাও, আমি সাজা দিচ্ছি। হাকিম আছে, থানা আছে, সেপাই আছে—চোরকে দেখিয়ে দাও তুমি, মাহাতো!

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি। জলু যেন জুড়িয়ে গেল। মেজর সিং সহাস্যে বললেন, এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত আছে, তোমার খামারের আলু পটল নিয়ে কে মাথা ঘামাবে জলু? শোনো ভাই, এ গভর্নমেণ্ট তোমার নিজের আছে। সরকারী নীতি এই কথা বলে যে, তোমাকে সব রকমে সাহায্য করবে, তোমার ভালো করবে! তোমাকে হায়রান করবার জন্যে তো হামরা এখানে বসে নেই! বুঝে শুনে কথা বলো ভাই। যাও, ঘরে যাও, জলু।

মাথা হেঁট করে জলু ঘরে এল। বুনি দাঁড়িয়ে ছিল বেড়ার পাশে। সে বললে, কথা শুনিয়ে দিল বটে পুল-সায়েব। তুই কি বললি, বুড়োদা?

কিচ্ছু না।—বলে জলু এসে বারান্দার ধারে বসল। যে-চোখে আগুন জ্বলছিল, সেই চোখে যেন শ্রাবণের মেঘের ছায়া দেখা গেল। বাস্তবিক, সে ছুটেছিল মিথ্যে। চোরকেও সে চোখে দেখে নি, খামারে যে তার সব্জি ফলেছিল, তারও প্রমাণ সে রাখে নি।

এক সময় উঠে জালটা টেনে গুছিয়ে নিয়ে সে নিজের মনে বেরিয়ে গেল এবং সামনের ঘাটে এসে ডিঙ্গিখানা খুলে দিয়ে সে নদীতে এগিয়ে চলল। ভাদ্রের নদী ভরেছে এবার। ঘূর্ণির পর ঘূর্ণি নিয়ে জল এবার ভয়ানক ছুটছে। অদূরে তালডহরীর পাড়ে-পাড়ে ভাঙন ধরেছে। মুরসাহেবের সেই পুরনো বাংলাটা পর্যন্ত জল উঠেছে। নদী চওড়া নয়, কিন্তু সাংঘাতিক তার শক্তি। আকাশে মেঘ হয়েছে ঘন, বাতাস বইছে দ্রুত, বৃষ্টি আসতে আর বিলম্ব নেই,—দামোদরের সেই উত্তাল বিক্ষুব্ধ চেহারা দেখে জলুর আনন্দের আর সীমা রইল না। ডিঙ্গি নিয়ে সে ভেসে চলল। জলের মধ্যে জাল নামিয়ে বজ্রমুষ্টিতে সে খোঁটা ধরে রইল।

ঘণ্টাতিনেক বাদে ডিঙ্গি নিয়ে জলু ঘাটে এসে নামল। বাতাসটা এবার নেমে গেছে, কিন্তু মেঘের সমারোহ তেমনিই চলছে। জালের মধ্যে পড়েছে ছোট একটা চিতল মাছ মাত্র, সের-দুই হবে কিনা সন্দেহ। মাছটাকে বার করে নিয়ে গামছায় সে বাঁধল। তারপর একবার জলের দিকে তাকাল। কি জানি কেন, জলুর মনে হল আজ তার বাঁচবার কথা ছিল না। শুধু যে

বড় বড় ঘূর্ণি তা নয়, জলের স্রোতে এমন ধাক্কা অনেককাল সে পায় নি। আর বোধ হয় দেরি নেই, ভয়ানক বান হয়তো শীঘ্রই এসে যাবে। আজ যেন মৃত্যুর গ্রাস তার জন্যে জলের ভিতর থেকে হাঁ করে ছিল।

লোকজনের সাড়াশব্দ পেয়ে সে একটু চকিত হয়ে উঠল। আরদালী আর চাপরাসি নিয়ে এক সায়েব এসে দাঁড়িয়েছে তার খামারের পাশে। এমন সময় দূরের থেকে তারণ সিং চেঁচিয়ে উঠল, হুজুর, হুঁশিয়ার,—উই জলু আসিয়েছে—

হুজুব ফিরে তাকালেন। জলু কাছাকাছি এগিয়ে এল। তারণ সিং পুনরায় সাহস পেয়ে বললে, হুজুর, সোবাই এখানে দেখেছে! হামাকে ডাণ্ডা পিটতে আসেছিল। লুটিসঠো নিয়ে কুচি কুচি করে ফেলেছে। হুজুর, হামি সরকারী নোকর আছে।

সাহেব ভাল কবে জলুকে লক্ষ্য করছিলেন। এবার বললেন, তোমারই নাম জলু মাহাতো?

হাঁ আজ্ঞে।

আমি সরকারী নোটিশ পাঠালুম, তুমি ছিঁড়তে গেলে কেন?

জলু একবার সাহেবের আপাদমস্তক তাকাল। পরে বলল, লেখাপড়ি জানি না, নুটিশ পাঠাইলে কেনে?

সাহেব প্রশ্ন করলেন, তারণকে মারতে গিয়েছিলে তুমি?

তারণ সিং সোৎসাহে বললে, মারিতে লায় হুজুর, খুন করতে আসিয়েছিল।—বলতে বলতে সে হাকিমের পিছনে সরে এল।

জলুর দৃষ্টির মধ্যে আগুনের স্পর্শ লাগছিল। তবু সে

শান্তকণ্ঠেই বললে, তুমার ওই কুত্তাটা এসে আমার পিছনে রোজ ঘেউ ঘেউ করে। তাই গাছের একটা ডাল নিয়ে—

হুজুর, শুনিয়ে! হামি সরকারী নোকর আছে, হামাকে বলে কিনা কুত্তা!—তারণ সিং বললে, গোবরমেণ্টকে তুমি গালি দিচ্ছ জলু? এ কেমোন সাহস আছে তোম্‌হার? তোম্‌হাকে হামি যদি বলি বুড়োঘুঘু, কেমোন লাগবে তোম্‌হার?

এবার মিষ্টকণ্ঠে হাকিম বললেন, তোমার নামে অনেক রিপোর্ট আছে জলু, কিন্তু সে সব থাক্‌। তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে বুঝিয়েই বলছি। তোমার এই জায়গাটুকু আমাদের না পেলেই চলবে না। ওই যে দেখছ কাটাখাল, ওর মুখে সাঁকো তৈরি হচ্ছে; এখানে সরকারী কাজের আপিস বসবে। এতে তোমার অনেক লাভ, জলু। টাকা পাবে, বেশি জমি পাবে, ঘরবসতি মালপত্র পাবে, - সুবিধে অনেক। ঘরদোর জমি যখন ছেড়ে দিতেই হবে, মিথ্যে হাঙ্গাম করে লাভ কি ভাই?—আচ্ছা, এখনই জবাব চাইনে। কিন্তু দেখছ তো মাটি কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমাকে আরও তিনদিন সময় দিয়ে যাচ্ছি, আসছে শনিবার বেলা বারোটার মধ্যে আমাকে জবাব দেবে। থানা পুলিস করে কোনও লাভ নেই, জলু।

হাকিম আর দাঁড়ালেন না। কিন্তু তারণ সিংয়ের মনে দুর্ভাবনা ছিল, হাকিমের আগে আগেই সে এগিয়ে চলল।

জলু সেখানে স্তব্ধ হয়ে মিনিটখানেক দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ গলা বাড়িয়ে ডাকল, সায়েব, শোন—

হাকিম পিছন ফিরলেন এবং দু পা এগিয়েও এলেন। জলু বললে, সাহেব, তুমি বদ্‌লির চাকরি করে বেড়াও—কোনও জমিনের ওপর তুমার মায়া লাই। আর এ জমিন আমার বাপ দাদা চোদ্দপুরুষের ভিটে—এ আমি ছেড়ে দেব না! তুমার যা খুশি করগে।

কাঁধে মাছ ফেলে জালটা টানতে টানতে জলু আবার খামারে গিয়ে ঢুকল।

বুড়োর হাস্যকর স্পর্ধা দেখে হাকিম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর মোটরখানার দিকে অগ্রসর হলেন।

ভিতরে এসে জলু মাছটা এক জায়গায় ফেলল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুনিকে দেখতে না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, বুনি চৌকিখানার উপরে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং তার হাতের পাশে একটি মস্ত কাঁচকড়ার সাজগোছ-করা দামী মেয়ে-পুতুল পড়ে রয়েছে।

সরকারী হাটে এমন সুন্দর পুতুল জলু অনেকবার দেখেছে। বুনিও পছন্দ করেছে বহুবার। কিন্তু এটি কেনা তার সাধ্যাতীত ছিল।

জলু এগিয়ে গিয়ে বুনির পাশে দাঁড়াল। পুতুলটার গাঁয়ে হাতটি রেখে মেয়েটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু হাতের স্পর্শ পেয়ে বুনি চোখ খুলে তাকাল। বললে, ভাত আছে হাঁড়িতে, নিয়ে খাস বুড়োদা।

জলু বললে, পুতুলটা দিল কে বটে?

বুনি বললে, ওই যে ঠিকাদার, বুলাকিলাল সায়েব।

অদ্ভুত একটা নাম শুনে জলু একটু থমকে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, তুর সঙ্গে ওর ভাব হল কেমন করে? তুরে চেনে বটে?

হাঁ, চেনে বটে! আসে রোজ। তুই গেলেই আসে। পুতুলটোর দাম কুড়ি টাকা!—বুনি হাসিমুখে তাকাল।

জলু আর কিছু বললে না, ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল। বুনি রোজ ভাত দেয়, আজ কিন্তু উঠতে চাইল না। সুখের ঘুমের মধ্যে সে জড়িয়ে রয়েছে আপন গভীর আনন্দে,—আজ আর ভাত বেড়ে দেবার উৎসাহ তার সেই। কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবতে ভাবতে জলু হঠাৎ সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললে, আমি ঘরে লাই তখন ঠিকাদার ভিতরে আসে কেনে?

বুনি উঠে এল বাইরে। বললে, চিল্লাচ্ছিস কেনে রে? তুর মাথার ঠিক নাই। উরা লোক ভালো বটে। তুকে ঘি খাওয়াবে, ফল খাওয়াবে,—টাকা চাইলে তাও দিবে বটে।

তার বদলে তোকে লিবে,—বুড়ো চেঁচিয়ে অনুযোগ জানাল।

লিবে কেনে? ভালোবাসে—!

বুনি বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। হয়তো এর বেশি আর বলাও চলে না! জলু ভাত খেলে না, শুধু মাছটা বের করে নিয়ে হাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

ঠিকাদারের কাজ ঠিকাদাররা করে চলেছে। হুকুম পেয়েছে, নক্সা পেয়েছে, তাদের কাজ আর থামবে না। সমস্ত ব্যাপারটার আয়োজন অতি দ্রুতগতি। ডুমুরগাছের তলা থেকে আরম্ভ করে পুলসাহেবদের বারান্দার প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত নদীর পাড়ের সমান্তরালে মাটি কাটা হয়েছে। সে-মাটি উঠেছে পর্বতপ্রমাণ হয়ে। ফলে হয়েছে এই, জলুর জমিটি প্রায় চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ। নৌকা বেঁধে রাখার জায়গাটুকুও তার গেল। শুধু তাই নয়, ডিঙ্গি টেনে এনে খামারে রাখবে তার পথ নেই। বিশাল চওড়া গর্তের উপরে মাত্র এক-একখানা তক্তা পাতা,— ভয়ে ভয়ে তার উপর দিয়ে পারাপার করতে হয়, অন্য পথ নেই। সেদিন দুপুরে ডিঙ্গি নিয়ে ফিরে এসে জলু দেখল, এরই মধ্যে ডুমুর গাছটাও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। বৃষ্টি এসে পড়েছে তখন মুষলধারায়। উপরদিকে তাকিয়ে জলু হঠাৎ চীৎকার করে ওঠবার চেষ্টা পেল, কিন্তু কাকে ডাকবে? নিম গেল, বট গেল, আজ ডুমুর গাছটাও গেল,—অথচ ওদেরই ছায়ার তলায় কত চৈত্রের রোদ বাঁচিয়ে সে কপালের ঘাম মুছেছে। ওর পাশে বুটুন ঘরামির সেই উঠোনে আসর পেতে কতকাল ধরে গাজন করেছে তারা! মনসা-শেতলা পুজোয় কত ঘটা! ওখানে তার বৌ ধান ভেনেছে কতদিন, ছেলেটা কতদিন খামার বানিয়েছে নিজের হাতে, ছেলের বৌয়ের জন্য স্নানের ঘাট বানাবার চেষ্টায় নিজের হাতে সে মাটি কেটেছে অনেক। ও জমিনটুকুর ওপর পা টিপলে এখনও ওর তলায় তারই বুকের

রক্ত সপসপ করে ওঠে। কিন্তু আজ প্রতিবাদ জানাবে কোথায়? হাজার হাজার মানুষ আর লোহালক্কড় ইটপাথরে ভরে গেল চারিদিক,—কিন্তু প্রাণের দরবার কই? কোথায় সে আবেদন জানাবে?

ডিঙ্গিখানা নিয়ে এদিকে ওদিক সে ঘুরে দেখল, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার মতো একটুখানি জায়গা আর কোথাও নেই। জল উঠেছে অনেক উঁচুতে, পাড়ের উপরে কাঁচা মাটিতে ডিঙ্গি বেঁধে রাখলে দড়ি ছিঁড়ে নৌকা যাবে ছুটে। জলু নিরুপায় হয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে অবশেষে প্রাণপণ শক্তিতে উপরদিকে টেনে হিঁচড়ে এক সময় ডিঙ্গিখানা তুলল। কিন্তু সেই বৃষ্টির মধ্যে শারীরিক কষ্টে, যন্ত্রণায় এবং বুকের ব্যথায় জলুর গলার মধ্যে এবার কাসির বেগ এল এবং ডিঙ্গির দড়িটা শক্ত মুঠোয় ধরে পা বাড়াতেই কাঁচা কাদামাটির ওপর পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে সে পড়ল। আছাড় খেয়ে সে আঘাত পেল না, কিন্তু ভিতর থেকে ভয়ানক কাসির বেগ ফেনিয়ে উঠতেই জলু ভয় পেল এবং সেখান থেকেই শেষবার চীৎকার করে ডাকল, বুনি —বুনি রে— আয় শিগ্‌গির—

বুনির বদলে জনৈক পেয়াদার কানে তার ডাক পৌঁছল। পেয়াদাটা অবশ্য খবর দিল বুনিকে। বুনি ছুটে এল বাইরে। চেঁচিয়ে ডাকল, বুড়োদা,—কুথারে বুড়োদা—?

বুনি ছুটল পাড়ের দিকে।

পিছন থেকে চাপরাসি রামলগন বললে, লুটিস আছে এই

হামাদের সঙ্গে, বুঝছিস বুনি? তোদের মালপত্তর সোব থাকবে হোই হামাদের চালাকে নীচে। তোদের ঘরঝোপড়া খালি করিয়ে দিচ্ছি।

তারণ সিং বললে, হামলোক কি করবে? এ ভাই সোরকারি হুকুম, হামাদের কসুর কুছ নেই।—

তারণ সিংয়ের গায়ে বর্ষাতি ঢাকা, মাথায় ছাতা,—তার ভাববারও কিছু নেই। ওরা দুজনে ঘরদোর ভেঙ্গে দিয়ে উৎখাত করবার কাজে লেগেছিল।

তক্তাখানার উপর দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে বুনি সেই নরম কাদামাটি ডিঙ্গিয়ে কোনমতে বৃদ্ধের কাছে পৌঁছল বটে, কিন্তু জলু ততক্ষণে কাশির বেগে কাদামাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই কাশির বেগ ও ধমক বুনিই শুধু জানে। জলু তখনও তার দৃঢ় মুষ্টিতে মোটা দড়িগাছটা ধরে ছিল। অবশেষে এক সময় সেই কাশির বেগ যখন কমল, তখন কণ্ঠের ভিতরটা পিছল হয়ে রক্ত গড়িয়ে এসেছে। কাদামাটির উপর দিয়ে সেই রক্ত গড়িয়ে নামল। বৃদ্ধ কিছু অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

বুনি এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, উঠতে পারবি এবার?

পারব। ওরে বুনি—আমার ডিঙ্গি? ডিঙ্গি গেল কোথা?

রক্তমাখা মুখে জলু এধার ওধার তাকাল। দড়ির গোড়াটা ও-মুখে আল্‌গা হয়ে ডিঙ্গিখানা ছট্‌কে জলের উপর দিয়ে ততক্ষণ

কোথায় ভেসে গেছে। বুনি সভয়ে দামোদরের দিকে তাকাল। বললে, তুর ডিঙ্গি আর পাবি না, বুড়োদা—

বুড়ো বোধ হয় আরেকবার ওই সৃষ্টি-স্থিতি-সৌরবিশ্বের দিকে কালকটাক্ষ হেনে চীৎকার ক'রে ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেল, কিন্তু দূরে বন্যার ভয়াবহ গর্জন শুনে বুনির হাতখানা আঁকড়ে ধরে বললে, বুনি—ওঠ্ শিগ্‌গির—জল আসছে—ওঠ্—চল্—তুরে আগে ঘরে রেখে আসি।

তুই কি করবি?

আমি জলে যাব, ডিঙ্গি ধরে আনব। কোশ তুইয়ের মধ্যেই পেয়ে যাব।

আঁতকে উঠে বুনি বললে, মরবি নাকি তুই বটে? বান আসছে না?

হাঁ—জলু বললে, আসছে বটে। বানেই ভাসব আমি। ডিঙ্গি আমার চাই। আগে তুরে রেখে আসি,—চ।

এক হাতে দড়ি নিয়ে অন্য হাতে বুনির নড়াটা ধরে জলু কাঁপতে কাঁপতে সেই প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর মাটিকাটা খাদ পেরিয়ে এল। এপারে এসে বুনি বললে, কুথা লিয়ে যাচ্ছিস, বুড়োদা? ঘরে আমাদের ঢুকতে দিবে না। ওরা দখল করছে!

কেনে?—জলু থমকে দাঁড়াল,—কে দিবে না ঘরে ঢুকতে?

বুনি বললে, থানা থেকে পেয়াদা এসেছে লয়? ঘরে থাকতে দিবেনি বটে। মালপত্তর রেখেইছে বটে উই চালার তলায়!

জলু আর কোনও কথা না বলে বেড়া পেরিয়ে খামারের পাশ দিয়ে ভিতরে এল। রামলগন, তারণ সিং, বৈদ্যনাথ, হরনাম—এবং আরও জনতিনেক লোক একদিকে যেমন চৌকি-হাঁড়ি-কাঁথা-বাসন প্রভৃতি বার করেছে, অন্যদিকে তেমনি বাইরের দিক থেকে কয়েকজন কুলি ইতিমধ্যেই ঘরের ছেঁচাবাঁশের দেওয়াল কাৎ করে ফেলেছে।

তারণ সিং এবার হাসিমুখে বলে উঠল, আরে ভাই, দেখো দেখো,—হামাদের জলু কেমন সং সাজিয়েছে! কাদামাটি মেখেছ, না ভূত বনেছ ভাই জলু? তোমাকে দেখিলে হাসি পাচ্ছে যে!

বজ্রগম্ভীর স্বরে জলু প্রশ্ন করল, এসব কি হচ্ছে?

হামাদের কসুর কি ভাই, হামারা ত' সোরকারি নোকর আছে। ওরা সব আসিয়েছে থানা থেকে। তোমহার ডেরা ভাঙ্গা গেছে ভাই জলু।

কোনমতেই আজকে আর জলু সামলাতে পারল না। বাঁ হাতে তার মুখের রক্তটা মুছে দু পা এগিয়ে সেই মোটা ভিজে কাদামাখা দড়িগাছা দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে তারণ সিংয়ের মাথায় সপাং করে সে মেরে বসল। হাতের ওজন ঠিক বুঝতে পারা যায়নি এবং তার বন্য হিংস্র আক্রোশের মাত্রাটাও সরকারি লোকেরা অতটা অনুধাবন করেনি। কিন্তু এই ভয়ানক অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে চীৎকার ক'রে তারণ সিং মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার জলু যখন সেই দড়ি সপাং করে মারল

বৈজনাথের পিঠে—তখন হৈ চৈ করে সবাই এসে বুড়োকে বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা পেল। বুনি কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু জলু মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ওই দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটে এল খামারের বাইরে। পুলসাহেব, ঠিকাদার, বুলাকিলাল, মেজর সিং, হাকিম—আজ সবাইকে সে নাকি এই দড়ি দিয়েই খুন করবে! চীৎকার উঠেছে চারিদিকে, সোরগোল উঠেছে পুলসাহেবদের বারান্দায়, লোহালক্কড়ের কারখানার ওদিক থেকে ছুটে এল সবাই। থানার একজন সেপাই তারণ সিং নাকি খুন হয়েছে!

বানের জল বিপুল গর্জনে তখন পাড়ের উপরকার স্তূপাকার মাটির উপর ধাক্কা দিচ্ছিল।

ওই একগাছা দড়ির সাহায্যে লড়াই করতে করতে হতভাগ্য জলু মাহাতো উঠে এল সেই অতল গভীর খাদের উপরকার তক্তাখানায়। একটু আগে হৃৎপিণ্ড থেকে যার অত রক্ত উঠে এসেছে তার দেহের ও পায়ের কাঁপুনি তখনও যায়নি। তবু উপস্থিত এই নিদারুণ উত্তেজনাটা সামলিয়ে নিয়ে সে হয়ত তার ডিঙ্গির খোঁজে জলে ঝাঁপ দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু সে ওই তক্তাখানার উপরে উঠে আর টাল সামলাতে পারল না। জলে ও কাদামাটিতে তক্তাখানা তার পায়ের তলা থেকে হঠাৎ পিছলে গেল, এবং তার অবশিষ্ট জীবনের ইতিহাসটুকু সহসা অন্ধকার খাদের গভীর নীচে পলকের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

পাড় ভেঙ্গে বড় বড় কাদামাটির চাংড়া দেখতে দেখতে সেই খাদের মধ্যে পড়ে জলুর জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে দিল।

অনেক লোকজন এসে পড়ল বটে সেই বৃষ্টিবাদলের মধ্যে। ঘটনার চেহারা দেখে শিউরে উঠল সবাই। কিন্তু সকলেই হতবাক্। আগামী মাসখানেকের মধ্যে নীচেকার মাটি তোলবার কোন সম্ভাবনা নেই। থাক্ না কেন জলুর হাড় ক'খানা মাটির নীচে, কার কী ক্ষতি! ওর ওপরেই উঠুক দাঁড়িয়ে একালের লৌহনগরী।

কিন্তু যে-ব্যক্তি বেঁচে আছে এখনও, তাকেই সবাই তুলল। তারণ সিংয়ের রক্তাক্ত অচেতন দেহ পড়ে রয়েছে খামারে। জলুর দড়ির ডগায় একটা গেরো ছিল, তারই প্রচণ্ড আঘাতে তারণ সিংয়ের মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। বৈজনাথেরও পিঠের মোটা চামড়া ছিঁড়ে গেছে।

* * * *

এসব ঘটনা অবশ্য বছর তিনেক আগেকার। বুলাকিলাল এখন বুনির জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নতুন পাকা ঘর, আসবাবপত্র, ইলেক্‌ট্রিকের আলোপাখা, খাটপালঙ্ক,—সব নিয়ে বুনি এখন একটি ফ্ল্যাটে বাস করে। ঠিকাদার বুলাকিলালের পরিবার বাস করে বহুদূর দেশে, সেজন্য বুলাকিলালের নানা অসুবিধা। শ্রীমতী বুনি এখানে তার তত্ত্বাবধান করে। আদর-যত্ন পেয়ে মেয়েটার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। নাচগানে এরই মধ্যে মেয়েটার খ্যাতি রটেছে।

পুলিশ সাহেব, দুজন ছোট বড় দারোগা, চারজন কনস্টেবল্ এবং জন দুই সাধারণ জামা কাপড় পরা গোয়েন্দা ভদ্রলোক,—তাঁরা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে রয়েছেন।

পাড়াপল্লী এবং এদিক ওদিক থেকে মস্ত এক জনতা ছুটতে ছুটতে এসে এ বাড়ীর আশেপাশে প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে জমায়েত হয়েছিল। তবু—ব্যাপারটা অসাধারণ কিছু নয়।

গত রাত্রি বারোটার পর থেকে আজ ভোর পাঁচটার মধ্যে কোন্ সময় যেন এই ঘটনা ঘটে। কেউ কখনও বিশ্বাস করে না, নালুবাবুর স্ত্রী এই কাণ্ড ক'রে বসবেন। মহিলার বয়স তিরিশ বত্রিশের কম নয়, এবং নালুবাবুর হতে চলল চল্লিশ। পুলিশ সাহেবের একটিমাত্র প্রশ্নের জবাবে নালুবাবুকে ঢোক গিলে একবার বলতে হয়েছিল,—আজ্ঞে না, বছর পনেরো হল আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু স্বামীস্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি কোনদিন হয়েছে মনে পড়ে না!

রাত্রে আপনি পাশের বাড়ীতে গিয়ে শোন্ কেন?

নালুবাবুর বদলে রায় সাহেব এগিয়ে এলেন জবাব দেবার জন্য। তিনি নালুর জেঠতুতো ভগ্নিপতি, এবং এ বাড়ীতে এসে উঠেছেন মাস দুই আগে। তিনি বললেন, দাঁড়ান্ মিষ্টার গুপ্ত,

এর জবাব আমি দিচ্ছি। দেখছেন ত, এঁদের মাত্র তিনটি ঘর। এর মধ্যে ভাল ঘরটি আমার দখলে। জানেনই ত, এককালে হাকিমি করতুম, নিরিবিলি থাকার অভ্যেসটি রয়ে গেছে। পাশের ছোট ঘরটিতে নালুর ছোট বোনটি, আর আমার দুই মেয়ে। আর ওই সিঁড়ির তলাকার পাশে, ওই যে ঝুপসি মতন ঘরটি দেখছেন,—ওটাকেও একালে ঘর বলা হচ্ছে। ওটায় থাকেন নালুর মা! কিন্তু এই পুরনো এঁদোপড়া একতলার অংশটুকুরই ভাড়া পঁয়ষট্টি টাকা। সে যাই হোক, নালুর শোবার জায়গা এখানে আর হয় না,—ওকে তাই রাতটা কাটিয়ে আসতে হয় পাশের বাড়ীর ওই ক্লাবরুমে। সারাদিন বেচারা আপিসে খেটেখুটে আসে ত! কিন্তু যাই বলুন মিষ্টার গুপ্ত, এমন লক্ষ্মী বৌ, এমন শান্ত মিষ্ট স্বভাবের মেয়ে অন্তত আমার জীবনে আমি দেখিনি! এ শুধু নালুর দুর্ভাগ্য নয়, এ দুর্ভাগ্য আমাদের সকলের। এ স্বীকার করতেই হবে।

পাশে দাঁড়িয়ে পাথরের টুকরোর মতো নালুবাবু একেবারে স্তব্ধ। তাঁর চোখ দুটো সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

বড় দারোগা প্রশ্ন করলেন, আপনি চাকরি করেন কোথায়?

নালুবাবু জবাব দিলেন, ইলেকট্রিকের অপিসে।

ক্ষমা করবেন, মাইনে কত?

দুশো পঁচাশী টাকা।

ফ্যামিলি মেম্বার কত?

মা, ছোট ভাই, দুটি অবিবাহিত বোন, আমরা স্বামী স্ত্রী—

দারোগা প্রশ্ন করলেন, শুনলুম যে মাত্র একটি বোন আপনার?

নালুবাবু বললেন, আজ্ঞে না, দুটি—তবে একটি থাকে এখন হাসপাতালে।

কথাটা রায়সাহেব পাশ থেকে আরেকটু জুগিয়ে দিলেন,—হাসপাতালে মানে বুঝতে পেরেছেন ত? মধ্যবিত্ত ঘরে আজকাল যে-রোগটি আকছার দেখা যাচ্ছে,—সেই একটু একটু জ্বর, সামান্য কাশি, আর রোগা হতে থাকা! এক্স-রে ক'রে যা পাবার তাই পাওয়া গেছে! এখন অনেকদিন মেয়েটিকে সেখানে থাকতে হবে।

আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কি রকম ছিল?

নালুবাবু বললেন, কোনদিন কোন অসুখ দেখিনি। ওঁর হাতেই সংসার ছিল। টাকাকড়ি খরচপত্রের সমস্ত দায়িত্ব—তাঁরই হাতে থাকত।

আপনি কোন খোঁজ-খবর রাখতেন না?

একটুও না।

ছোট দারোগা তাঁর নোট বইতে কি যেন সব টুকে নিচ্ছিলেন। বাইরে জনতার ভিড় বেড়ে উঠেছে। পাশের ঘরের মেয়েমহল থেকে চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

দারোগা প্রশ্ন করলেন, ছোট ভাইটি কি চাকরি করে?

আজ্ঞে না—নালুবাবু জবাব দিলেন, আগে একটা ট্যুইশনি করত, এখন সেটা নেই। চাকরির জন্যে সে এখন ঘুরছে।

পুলিশ-সাহেব এবার ঈষৎ হাসির সঙ্গে বললেন, এটা একটু

আশ্চর্য বৈ কি। পঁয়ষট্টি টাকা বাড়ীভাড়া, আপনারা হু'জন মেম্বার, তারপর এঁরা রয়েছেন চারজন—

রায়সাহেব বললেন, হ্যাঁ, তা আমার চাকরটিকে নিয়ে চারজন বৈ কি। তবে কি জান নালু, আমিও কদিন ভাবছিলুম—হুমাস হয়ে গেল রয়েছি, তুমি আর কত টানবে আমাদের! এবার যাব-যাব করছিলুম!

পুলিশ সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার ওই হুশো পঁচাশী টাকায় এসব কুলোতে পারতেন? এত বড় সংসার—

মৃহুকণ্ঠে নালুবাবু বললেন, পারা যেত কিনা আমার স্ত্রীই সব জানতেন। ঘরকন্না চালাবার সমস্ত দায়িত্বই তাঁর হাতে ছিল।

রায়সাহেব সোৎসাহে এবারে বললেন, হয় না, হয় না,—বুঝলেন মিষ্টার গুপ্ত, এমন মেয়ে সচরাচর হয়না। আমার শালার বৌ ব'লে বলছিনে, কিন্তু এমন মিষ্ট ব্যবহার, মধুর স্বভাব, এমন ভদ্র মন—একালের বাংলা দেশেই খুঁজে পাওয়া কঠিন।—আরে, তোমরা চারদিক থেকে এসে এত ভিড় করছ কেন ভাই? সবাই শোকতাপে আচ্ছন্ন, আর তোমরা এলে রথ-দোল দেখতে! সরো, একটু বাইরে যাও—

কতকগুলি লোক ও ছেলেছোকরা পথে নেমে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

পাড়ার কিছু কিছু লোকজন জানে, রায়সাহেব একজন অবসর প্রাপ্ত মহকুমা হাকিম। তাঁর বড় বড় মেয়ে হুটি মধ্যে মাঝে

মেট্রোয় যায়, এবং তাঁর নাকি খুব প্রতাপ ছিল কোচবিহার সামন্ত-রাজ্যে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক দুজন বোধ করি এরই মধ্যে আশপাশে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। নালুবাবুর একতলার অন্য অংশটায় থাকেন বীরেশ্বরবাবুরা। তাঁদের বাড়ীতে লোকজন কম। কর্তা গৃহিণী, একটি বিবাহিত যুবক,—তার স্ত্রী এখন বাপের বাড়ীতে আছে, এবং জনৈক বিবাহিতা রুগ্না ভগ্নি,—তার তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আপতত এখানেই থাকে। ওঁদের বাড়ীতে চাপা কান্না শোনা যাচ্ছে, কারণ নালুবাবুর স্ত্রী সরোজিনী ওঁদের পরিবারেও অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাইরে থেকে কোনও নষ্টবুদ্ধি যুবকও এ বাড়ীতে কখনও আনাগোনা করেনি। সেদিকে সরোজিনী সাধ্বী ও চরিত্রবতী ছিলেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীর সহিত বিগত পনেরো বৎসর কালের মধ্যে একটি দিনের জন্যও কখনও সরোজিনীর বচসা বাধেনি। পাড়ার লোক এবং পাশের বাড়ীর মহিলারা সেই কথাই বলাবলি করছিলেন। দেবদ্বিজে ভক্তি, পাল-পার্বণে শিবতলায় গিয়ে নৈবেদ্য চড়িয়ে আসা, শাশুড়ীর রান্না বান্না করে দেওয়া, দেবর-ননদের তদ্বির-তদারক, ওরই মধ্যে পয়সা-কড়ি বাঁচিয়ে নালুবাবুর জন্য রাত্রের দিকে একপোয়া খাঁটি দুধ জ্বাল দিয়ে রাখা, সময় অসময়ে ননদের জন্য এক আধখানা শাড়ি কিনে দেওয়া, হাসপাতালে নিয়মিত ফলমূল মাখন বিস্কুট পাঠানো, শাশুড়ীর বাতের মালিশ, দেবরের ফুটবল মাঠে আনাগোনার খরচ,—

সরোজিনী যেন এ সংসারটির আগাগোড়া প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গেই জড়িত।

পাশের ঘরে শাশুড়ী বসে ডুকরে কাঁদছিলেন। কান্নার আভাস মাত্র ছিল না নালুবাবুর চোখে, না ছিল বা সকরুণ বিস্ময় —তাঁর দুই চক্ষু সম্পূর্ণ শূন্য ও অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ সাহেব সেটি লক্ষ্য করে এক সময় তাঁর নিজের মুঠো থেকে সরোজিনীর লেখা শেষ চিঠিখানা পুনরায় তুলে ধরে বললেন, যদি ইচ্ছা হয় আপনি আরেকবার এই চিঠি পড়তে পারেন, মিষ্টার চক্রবর্তী। চিঠি ত আপনারই।

নালুবাবু বললেন, না আপনিই পড়ুন। রায়মশাই শুনবেন।

পুলিশ সাহেব পড়লেন, "শ্রীচরণেষু, চিঠি লিখে না গেলেও চল্‌ত, কেন লিখছি জানিনে। এতদিন মরবার সময় ছিল না। আজ হঠাৎ যেন মরতে ইচ্ছা হল। কারণটা খুব সামান্য, কিন্তু সেটাও তোমাকে বলে যাওয়া হল না। আমার প্রণাম নিও।—সরোজিনী।"

চিঠি পড়ে পুলিশসাহেব পুনরায় মুখ তুললেন। বললেন, কারণটা সামান্য! কিন্তু আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?

নালুবাবু তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন! রায়সাহেব এবার সহসা উৎসাহ বোধ করলেন। বললেন, মানে, অর্থাৎ বুঝতে পারছ কিছু, নালুভাই! ধরনা কেন, তিনি স্ত্রীলোক ত বটে! তোমার কাছে হয়ত গয়নাগাঁটি চেয়ে থাকতে পারেন, কিম্বা হয়ত আজকালকার সব দামী-দামী

নাইলোন্ শাড়ি তোমার কাছে দাবী করেছিলেন। মানে, ওই আর কি, কিছু না পেয়ে মন ভেঙ্গে যাওয়া।

নালুবাবু বললেন, আপনি ত প্রায় আড়াই মাস ধরে দেখছিলেন, তাঁকে কি তেমন মানুষ বলে মনে হয়েছিল?

না ভাই নালু, তা যা বলেছ! এ মেয়ের শরীরে কোন লোভ আছে, কেউ বলবে না!—রায় সাহেব বললেন, ওই ত আমার মেয়ে ছুটি, ইলা আর বেলা—ওরা কি বলে জান? ছোটমামী খাইয়েই গেল সবাইকে, কিন্তু নিজে কি খেয়ে গেল কেউ দেখল না!—বুঝলেন মিষ্টার গুপ্ত, আশ্চর্য নির্লোভ মেয়ে। শুধু নির্লোভ? স্বামীর প্রতি এমন ভক্তি ভালবাসা সাধারণত দেখা যায় না! আচ্ছা নালু, বলতে পার, খরচপত্র নিয়ে তোমার সঙ্গে তাঁর কখনো মনোমালিন্য ঘটেছে? মানে, মেয়েছেলে কিনা, একটু মেয়েলি মনোভাব থাকে বৈ কি।

তাঁর ওসব ছিল না।—নালুবাবু জবাব দিলেন।

হুঁ। তা হলে প্রশ্নটা থেকেই গেল, বুঝলেন মিস্টার গুপ্ত?

মিস্টার গুপ্ত এবার বললেন, এবার আমাদের এদিকে সব ব্যবস্থা করতে হয়!—এই বলে তিনি হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় বললেন, বেলা নটা বাজে। আসুন মিস্টার চক্রবর্তী।

ভিতর মহলে কয়েক পা অগ্রসর হলেই সিঁড়ির ঠিক পাশে সেই ঝুপসি একখানা ছোট্ট ঘর। এটিতে ভাঁড়ার থাকে, এবং শীতের দিনে নালুবাবুর মাকে এই ঘরেই রাত কাটাতে হয়।

গতকাল গুমোট ছিল, তাই মা এঘরে শোননি। পুলিশ সাহেব এগিয়ে এলেন। ঘণ্টা দুই আগে থেকে একজন কনস্টেবল্ এই ঘরটির পাহারায় রয়েছে। মিষ্টার গুপ্ত এসে মৃতদেহটির দায়িত্ব নিলেন, কনস্টেবল্ সরে দাঁড়াল। ওধার থেকে রায় সাহেব বলে উঠলেন, একটু—একটু দাঁড়ান, মিস্টার গুপ্ত। কই, কই মা বেলা—আমার সেই মাপের ফিতেটা শীগ্‌গির বার করে দাও ত? যত বিপদই হোক, এসব ব্যাপারে ভুল করলে চলবে না। মাপজোপ সব কাঁটায়-কাঁটায় থাকা দরকার।

মিনিট খানেকের মধ্যেই শ্রীমতী বেলা একটি মাপের ফিতা বার করে এনে রায় সাহেবের হাতে দিল।

ওকি, চোখের কোলে জল কেন? তোমরা কেঁদো না,—দয়া করে এ সময় কেউ কেঁদো না!—ফিতাটি নিয়ে সোজা রায়সাহেব ঝুপসি ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলেন। শোক দুঃখ করার সময় তাঁর হাতে এখন নেই।

সামনে একখানা চৌকি, তার উপর একটি টুল, তার উপর মস্ত একটি সেকালের পিতলের হাঁড়ি। বুঝতে পারা গেল, এই হাঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে সরোজিনী ঝুলে পড়েছিলেন। কড়িকাঠের আংটার সঙ্গে পুরনো শাড়ি পাকিয়ে গলার সঙ্গে ফাঁস লাগান। পাছে সাড়াশব্দ হয়, অথবা নিশ্চিত মৃত্যু না হয়, এজন্য তিনি নিজেকে দুলিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। রায়সাহেব ক্রুতহস্তে আগাগোড়া মাপজোপ করে দেখতে লাগলেন। ঘরখানা ক'ফুট লম্বা চওড়া, চৌকি টুল ও হাঁড়ির মাপ। নীচের থেকে সরোজিনীর

দুখানা পা কত উঁচুতে, দেওয়াল থেকে দেহটা কতটা দূরে, প্রবেশপথের আন্দাজ, সরোজিনীর পায়ের মাপ ও শারীরিক উচ্চতা, চুল বাঁধা না আল্‌গা, শাড়ির আঁচলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, জিব আধ ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে কি না, মৃতদেহের মুণ্ড কোন্‌ দিকে—।

মিস্টার গুপ্ত বললেন, এত কি দরকার হবে, মিস্টার রায় ?

বোঝেন না, বোঝেন না মিস্টার গুপ্ত,—রায়সাহেব বললেন, এতকাল এই সবই ত করে এসেছি ! সব এভিডেন্স্‌ আগাগোড়া চাই। দুঁদে 'করোনার' যদি হয় তাহলে নালুকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে ! তা ছাড়া বোঝেন ত, নালুর শ্বশুর-বাড়ীর লোক যদি বেকায়দার কথা বলে, তখন আমাকেই তো দাঁড়াতে হবে।—না না, বাধা দেবেন না, মিষ্টার গুপ্ত, এসব একেবারে আমার নখদর্পণে। আর এই সব কাজেই ত এককালে আমার নাম ছিল। নৈলে ইংরেজ আমলে কি এমনিই আমাকে 'রায়সাহেব' টাইটেল দিয়েছিল ?—আঃ কে আবার কাঁদছে ওঘরে ? তখন যে মানা করে এলুম ? এটা কি কান্নার সময় ? যাও নালু, গুরুতর ঘটনার সময় কাঁদতে নেই, বলে এসো। এত কাঁদলে আমি কোন কাজ করতে পারব না। যাও—

নালুবাবুর দৃষ্টি ছিল সরোজিনীর মুণ্ড এবং দুখানা পায়ের দিকে। একটু অবাকই হতে হয়। সরোজিনী এমন করে কোনদিন মাথায় সিঁদুরও চড়ায়নি,—দুই পা জুড়ে এমন করে আলতাও কোনদিন পরেনি। এবার হঠাৎ রায়সাহেবের হাতের

ধাক্কা পেয়ে নালুবাবু ছিট্‌কে একবার বাইরে গেলেন এবং কেন গেলেন বুঝতে না পেরে মিনিট দুই পরে আবার ফিরেও এলেন।

বাড়ীর বাইরে ততক্ষণে একখানা গাড়ী এসে পড়েছে। সরোজিনীর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে ঘর্মাক্ত দেহে রায়সাহেব তাঁর ফিতাটি নিয়ে তখনও এদিক ওদিক ঘুরছিলেন।

হঠাৎ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নালুবাবুর ছোট ভাই রমেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল,—তুমি কি জান দাদা, দুমাস থেকে বৌদিদির আধপেটা খাওয়াও জোটেনি? জান, কি ভাবে বৌদি খরচ চালাচ্ছিল?

নালুবাবু কঠিন দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, হাজার-হাজার পরিবারের বৌরা এমনি করেই দিন চালায়। সবাই সুসাইড্ করে না!

রায়সাহেব বললেন, তুমি ছেলেমানুষ এটা প্রমাণ করো না, রমেন। পুরুষমানুষ এত সেন্টিমেণ্টাল্ হলে চলে না!

কাঁদতে কাঁদতে রমেন সেখান থেকে সরে গেল।

অতঃপর মিস্টার গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, ডেড্‌বডি আপনারা নামাবেন, না আমরাই নামিয়ে নেবো?

নালুবাবু বললেন, আমি নীচের দিক থেকে ধরি, আপনারা ওপরের গেরোটা খুলে দিন—

ছোট দারোগা এবং একজন কনস্টেবল তক্তাপোষের উপরে উঠে টুল ও হাঁড়ি সরিয়ে পাকানো শাড়ির উপর দিককার

গেরোটি খোলবার আয়োজন করতে লাগল। এই অবসরে রায়সাহেব দৌড়ে একবারটি তার নিজের ঘরে গেলেন এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তাঁর নোটবই আর কলমটি নিয়ে এলেন।

শাড়ির গেরোটি খুলে ততক্ষণে মৃতদেহটিকে নামান হয়েছে।

আঃ—মুখের অমন বিশ্রী শব্দ করছ কেন ভাই, নালু?—রায়সাহেব ধমক দিলেন,—যাও, এবার সরে যাও। কাজ করতে দাও আমাকে।—এই বলে তিনি চৌকির উপরে উঠে সরোজিনীর জিহ্বার বাহিরের অংশটুকু ফিতে দিয়ে মাপলেন, চুলের গোছাটা বাদ দিয়ে মাথার পরিধিটাও দেখে নিলেন। না, অসাধারণ কিছু নয়।

পুলিশ সাহেব হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রায়সাহেবের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন।

রায় সাহেব তাঁর নোটবইতে টুকতে লাগলেন,—রং ফর্সা, চোখ দুটো খোলা,—প্রায় এক ইঞ্চি। জিব দেড় ইঞ্চি বাইরে। স্বাস্থ্য ভাল। এলো চুল ঘন কালো। মুখ বন্ধ।—বেশ, এবার আমার কাজ হয়ে গেছে। কি জানেন, মিস্টার গুপ্ত, কাজ না করে আনন্দ পাইনে। আর দেখছেন, এই যে নোটবই রইল—এর পর আর টুঁ শব্দটি করবার যো নেই। এখানা ফেলে দেব হাকিমের সামনে,—ব্যস, নালুর আর বিপদ নেই।

রায়সাহেব এবার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গেলেন কলতলায়, সেখানে হাত দুখানা ধুয়ে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন।

পুলিশের পক্ষে যেগুলি কৃত্য, সেগুলির ত্রুটি হল না। তারপর সেই মৃতদেহটি বার করে নিয়ে গিয়ে বৃহৎ এক জনতার ভিড় ঠেলে গাড়িতে তোলা হল। কিন্তু রায়সাহেব সমস্ত ব্যাপারটি এমনভাবে আয়ত্তের মধ্যে এনেছিলেন যে, হৈচৈ করে কান্নাকাটি করবার কোন উপায় ছিল না।

সরোজিনীর মৃতদেহ নিয়ে দুজন অফিসার এবং দুটি কনস্টেবল্‌সহ গাড়িখানা এক সময় ছেড়ে চলে গেল।

তদন্তের জন্য রইলেন মিস্টার গুপ্ত এবং তাঁর দুজন সহকারী। তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী এখনও আসেনি। সেজন্য তাঁরা এগিয়ে এসে বাইবের ঘরে অপেক্ষা করার জন্য ঢুকলেন।

আসুন, আসুন মিস্টার গুপ্ত। এইটিই নালুর ঘর—বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিতেই যা একটু আলো-হাওয়া আসে।—রায়সাহেব সোৎসাহে বললেন, নালু এটি আমাকেই ছেড়ে দিয়েছে!

মিঃ গুপ্ত বললেন, আপনার ফ্যামিলির সবাই এখানে থাকেন?

ফ্যামিলির মধ্যে আর কে আছে বলুন? স্ত্রী মারা গেছেন এই তেরো বছর হল। তিনি ছিলেন নালুর জ্যাঠতুতো ভগ্নি। তবে কি জানেন, ভাইবোনের দেখাশোনা ছিল সেই ওদের ছোট বেলায়। আর আমি তো থাকি চিরকাল বিদেশে। আমার ছেলে ওই একটিই, সে এখন চাকরি করে দিল্লীতে। শুনলুম নিজের মতে সে বিয়েও করেছে।

মিস্টার গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, আপনি পেন্‌শন নিয়েছেন কদ্দিন?

রায়সাহেব বললেন, তা এই দশ বছর হতে চলল বৈকি। বেঁচে গেছি মশাই! এঁরা আবার আমার পুরনো সার্ভিস রেকর্ড ঘেঁটে আমাকে হয়রাণ করতে চান—এই আমাদের দেশী প্রভুরা!

মিঃ গুপ্ত একটু হাসলেন।

বিশ্বাস করুন মশাই,—রায়সাহেব বললেন, চাকরিতে সুখ ছিল ইংরেজ আমলে! কাজ করলে তারিফ করত, দামও দিত! রামরাজত্ব ব'লে এঁরা চেঁচাচ্ছেন, কিন্তু রামরাজত্ব সত্যিই আমরা দেখে এসেছি!—এই যে, এসো মিলু—হেঁ হেঁ, এরই জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম।

নালুর ছোট বোন মিলু একটি প্লেটে ক'রে দুখানা মাখন-টোস্ট, দুটি ডিমসিদ্ধ এবং এক পেয়ালা গরম দুধ এনে রায়সাহেবের সামনে রেখে দিয়ে গেল। মেয়েটার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে।

হাসিখুশী মুখে রায়সাহেব বললেন, এই তো চাই! দেখুন—বিপদ আপদ যাই হোক, নালুর এখানে কেউ নিজের কর্তব্য ভোলে না। আর এই ধরনের ব্রেকফাস্ট খাওয়া আমার চিরদিনের অভ্যাস, মিস্টার গুপ্ত। আপনাকে এক পেয়ালা চা দিতে বলব কি? ওরে, কে আছ—?

বাধা দিয়ে মিঃ গুপ্ত বললেন, না না, ধন্যবাদ—চা আমি খাইনে।

কিন্তু রায়সাহেবের গলার আওয়াজ শুনে মিলুই পুনরায় এসে

ঢুকল। এবার তার হাতের প্লেটে তুটি পাকা কলা। রায়সাহেব তারিফ করে বললেন, এই ত চাই মিলু, কলাতুটির কথা ভোলনি দেখছি। তোমার এই 'সেন্স্ অফ ডিউটি' দেখে ভারি আনন্দ পেলুম।

মিলু একটি কথাও বলতে পারল না। যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনিই চলে গেল। রায়সাহেব সাড়ম্বরে ব্রেক্ফাস্টে বসে গেলেন।

পুলিশসাহেব মিঃ গুপ্ত একটু যেন হতবুদ্ধিই হয়ে রইলেন।

আমার ছোট মেয়েটি মিলুরই বয়সী,—রায়সাহেব টোস্টে কামড় দিয়ে বললেন, আই-এ পর্যন্ত পড়ে এখন বলছে, বাবা, আমি সিনেমার ছবিতে নামব! আমি বলি, বেশ ত, চল্ কলকাতায় তোর এক মামার ওখানে,—সেখানে থেকে চেষ্টা করিগে! ওরা ওদের মামাকে এই প্রথম দেখল। তবে দেখছেন ত, ওসব সিনেমার ব্যাপার-ট্যাপার খুব সুবিধের নয়—

আপনি কি নিজে এখানে কোনও কাজে আছেন?

তুঃখের কথা আর বলবেন না, মিস্টার গুপ্ত।—রায়সাহেব ডিমসিদ্ধ চিবোতে চিবোতে বললেন, তুটো কাজ নিয়ে এখানে বসে রয়েছি। বড় মেয়েটির বিয়ের চেষ্টা, আর নিজের জন্যে রেল-আপিসে আনাগোনা।

আবার কি চাকরি করবেন?—হাসলেন মিঃ গুপ্ত।

রায়সাহেব বললেন,—হ্যাঁ, তা বৈকি, কিছু একটা করতেই হবে। হাত একেবারে খালি। তাছাড়া মেয়ে তুটির ভবিষ্যৎ।

পেন্‌সন্‌ আমার নামমাত্র। এই দেখুন না, আড়াই মাস এখানে হাত গুটিয়ে বসে নালুর অন্ন ধ্বংস করছি! কাজ একটা চাই বৈকি।

রায়সাহেব ছুধের পেয়ালায় এবার চুমুক দিলেন।

এতক্ষণে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। মিঃ গুপ্ত এবার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নালু এলেন পিছনে পিছনে এবং নিজের কোঁচার খুঁটে চোখ ছুটো মুছে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বিদায় নেবার আগে পুলিশ-সাহেব মৃছুকণ্ঠে বললেন, আপনাব স্ত্রীর সুইসাইডের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। প্রকৃত অপরাধ কোথায়, তাও স্পষ্ট। কিন্তু এদেশে এমন কোন আইন নেই যে, সেই অপরাধের শাস্তি হয়। —নমস্কার।

মিস্টার গুপ্ত গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পিছন দিকে নালু দাঁড়িয়ে রইলেন অবাক হয়ে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

মূঢ়চক্ষে সেইদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে এবার নালু উঠে এলেন বাইবের ঘরে। রায়সাহেব ততক্ষণে পাকা কলা ছুটি শেষ করেছেন। নালুবাবুকে দেখে তিনি একটি উদ্গার তুলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, এসব বড়ই ছুঃখের কথা, বুঝেছ নালু? পয়সাকড়ির অভাবে তোমার বউ সুইসাইড ক'রে বসবে, এ তোমরা যতই বল, আমি বিশ্বাস করিনে।

তবে হ্যাঁ, এ ছুমাসের মধ্যে আমাকে একটু খেয়াল করিয়ে দিলেই পারতে। দশ বিশ টাকা যোগাড় ক'রে না হয় তোমার

বউয়ের হাতে দিতুম। যাই হোক, তোমার পক্ষে একটা সান্ত্বনা, কি ভাগ্যি তোমাদের ছেলেপুলে নেই!

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নালু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সরোজিনী বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। পার্টিশনের পাশে ওদিকের মহলে বীরেশ্বরবাবুদের বাড়ীর মহিলারা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করেছিলেন, তাঁরা এখন চুপ করে গেছেন। নালুবাবুদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। কাঁদবার শক্তিও তাঁদের নেই। সমস্ত দিন এ বাড়ীতে হাঁড়ি চড়েনি। রায়সাহেব তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বড় মেয়ে ইলা বাড়ীতেই ছিল।

বীরেশ্বরবাবুর ছেলে সমীর এসে নালুবাবুর ভাইবোনদের ডেকে নিয়ে গেল। ওবাড়ীতে এদের জন্য রান্না হয়েছে।

কিন্তু এদিক ওদিকে চুপ করে গেলেও বৈকুণ্ঠবাবুর বিধবা ছোট বোন পাশের বাড়ি থেকে গরগর করছিলেন: কি রইল? বলি, রইল কি? পাঁচজনের মুখের সুখ্যাতি? সুখ্যাতি চাইছে কে গো?

কে যেন পাশ থেকে তাঁকে থামাবার চেষ্টা করছিল। নালুবাবুর মা এবাড়ি থেকে কান পেতে ছিলেন।

বলি কেন থামব? পুলিশের কানে ওঠে উঠুক! আজ তিনমাস থেকে বউটা ওই বুড়ো ননদাইটের জন্যে দুঃখ পাচ্ছিল। দিনে পাঁচবার করে বুড়োটা ব'সে ব'সে রাজভোগ গিলছে, আবার বাঘা-ভাল্লুক মেয়ে দুটোকেও গেলাচ্ছে। জ্ঞান-বিবেচনা

কিছু নেই গা? তার ওপর আবার তম্বি! বলে কিনা আমি ইংরেজ আমলের হাকিম, সবাই সাবধান! তিনমাস ধরে একটা গেরস্থকে পোষা কুকুর বানিয়ে রাখল, আর ওই তোমার নালু—গাড়োলটার মুখে একটা কথা এলো না?

আঃ পিসি, চুপ কর বলছি?

কেন চুপ করব না?—বৈকুণ্ঠবাবুর ভগ্নি তাঁর কণ্ঠ অধিকতর উচ্চগ্রামে তুললেন,—পাড়ায় কি মানুষ নেই? আজ তিরিশ বছর হল নালুকে দেখছি। সরোজিনীকে আমিই না বরণ ক'রে ঘরে লক্ষ্মী তুলেছিলুম? এমন বৌ এ পাড়ায় একটি নেই। এই সেদিন বাঁ হাতের শেষ চুড়িগাছা মুকুন্দ স্যাকরাকে বিক্রি ক'রে ওই বুড়ো হাকিম বেটার রসদ যুগিয়েছে! ঘরের বাসন বেচেছে, পুরনো বেনারসী বেচেছে, আঙ্গুলেব আংটিটা পর্যন্ত বেচে ওদের খাইয়েছে! কেন চুপ কবব না? কা'ব ভয়ে? হোক না থানা পুলিশ! আমি গিয়ে সাক্ষী দেব!

এবাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে নালুবাবু এক সময় ওবাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। সোজা গিয়ে বৈকুণ্ঠবাবুর ভগ্নির কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। বললেন, ছোড়দি –

ফুঁশিয়ে উঠলেন ছোড়দি,—আমাব কাছে এলি তুই কি জন্যে? মেনিমুখো হয়ে থাকিস ভগ্নিপতিটাব কাছে! কেন—সময়মতন বুড়োকে তাড়াতে পারিসনি? তুই দায়ি, তোর মা দায়ি, তোর ভগ্নিপতি আর ভাগ্নিরা দায়ি,—তোরা সবাই খুনে! তোরা খুন করেছিস ঘরের বউকে।

বলতে বলতে ছোড়দি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে ঠাণ্ডা করা নালুবাবুর পক্ষে কঠিন ছিল।

ছোড়দি একটু সামলিয়ে আবার বললেন, শুধু কি গণ্ডে-পিণ্ডে খাওয়ান! এখন বুঝতে পারছি সরোজিনী লুকিয়ে লুকিয়ে কেন ধার করত! তোর ওই ভগ্নিপতি মিন্সে যে আবার যখন-তখন লুকিয়ে হাতখরচ চাইত—এসব খবর কি তুই রাখতিস্?

আমাকে কিছুই সে বলত না, ছোড়দি!

কেন বলবে? তুই কি মানুষ? তোদের মতন গাড়োলরা কি ঘরের লক্ষ্মীর মানসম্ভ্রম রাখতে জানে? সে মরেছে অপমানের দায়ে, হাতীর খোরাক আর যোগাতে পারছিল না—সেই দুর্ভাবনায়! আমার খ্যামোতা থাকলে তোদের শালা-ভগ্নিপতিকে এক দড়িতে বেঁধে গারদখানায় পাঠাতুম!—ছোড়দি বললেন, যা এবার, অন্ধকার ঘরে শুয়ে মেয়েলি কান্না কাঁদগে যা।

ছোড়দি সেখান থেকে নিজেই উঠে গেলেন।

সন্ধ্যার পর এক সময় চুপি চুপি ও-মহলের বীরেশ্বরবাবু তাঁর স্ত্রীকে ঘরে ডেকে আনলেন। প্রশ্ন করলেন, ওরা সবাই খেয়ে গেছে?

যোগমায়া বললেন, হ্যাঁ। শুধু নালু আর দিদিকে কোনমতেই খাওয়ান গেল না।

শোন, এদিকে এসো।

যোগমায়া এগিয়ে গেলেন। বীরেশ্বরবাবু চাপাকণ্ঠে বললেন, মঙ্গলবার রাত্রে কি যেন হয়েছিল তখন বলছিলে?

দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিয়ে এসে যোগমায়া চুপি চুপি বললেন, তুমি যেন চেঁচিয়ো না!

না, বল।

যোগমায়া গলা নামিয়ে বললেন, বৌমার খবর নেবার জন্যে সমীর বেরিয়েছিল বিকেলে, সে ত' তুমি জান। সমীর ফিরল রাত তখন দশটা। খেয়ে দেয়ে আলো নিভিয়ে সমীর শুয়ে পড়ল।

তারপর?

এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে যোগমায়া বললেন, রাত বোধ হয় তখন বারোটাই হবে। হঠাৎ আমার সন্দ' হল। সমীরের ঘরে ঢুকে দেখি, অন্ধকারে সরোজিনী!

গলা ঝাড়া দিয়ে বীরেশ্বরবাবু প্রশ্ন করলেন,—মানে?

যোগমায়া বললেন, সমীর ঘুমোচ্ছিল অকাতরে,—সরোজিনী কি যেন খুসখাস করছিল আশপাশে। অত রাত্রে ব্যাপারটা আমার বড্ড খারাপ লাগল। পরের ঘরের বৌ! এদিকে আমার বৌমা রয়েছে হাসপাতালে, ওদিকে নালু গিয়ে শোয় ক্লাব ঘরে,– আমার মাথা যেন ঝিমঝিম করে উঠল।

কিন্তু সমীর ত নালুর বৌকে খুব মান্য করে! পায়ের ধুলো নিয়ে বৌদিদি বলে ডাকে। বয়সেও সমীর ছোট।

হলেই বা, পুরুষ ছেলে ত'! মাথা বিগড়োতে কতক্ষণ!

তাছাড়া রাত বারোটায় অন্য বাড়ির বউ এসে পরপুরুষের ঘরে পা টিপেটিপে ঢুকবে, এ কোন্ দিশি কথা গা? আমি বড্ড রেগে গেলুম।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, তোমার কি ধারণা হল? কোন কু-মতলব ছিল মনে হয়?

যোগমায়া বললেন, অতটা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু সরোজিনীর চেহারাও আমার ভাল লাগেনি। সেইজন্যে আমার মেজাজটাও খারাপ হয়ে গেল। কলতলার দিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। হয়ত অতটা না বললেই হত। সরোজিনী মাথা হেঁট করে রইল।

সমীর কি সত্যিই তখন ঘুমোচ্ছিল?

হ্যাঁ, অঘোরে ঘুমোচ্ছিল!

বীরেশ্বরবাবু কি যেন কিয়ৎক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন। পরে বললেন, মাঝরাত্রে মতলব একটা না থাকলে পুরুষ মানুষের ঘরে লুকিয়ে ঢুকবেই বা কেন! কিন্তু -কিন্তু সরোজিনী ঠিক তেমন মেয়ে ত' ছিল না! কোথায় যেন একটা ভুল থেকে যাচ্ছে, বড় বৌ।

সে-কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু কি জান, মেয়েমানুষের মন, না মতিভ্রম!— যোগমায়া ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রায়সাহেব আগামী কাল বিদায় গ্রহণ করবেন। বৈকুণ্ঠবাবুর ভগ্নির কথাবার্তার বিবরণ বড় মেয়ের মুখে শুনে আজ রাত্রের

মতো তিনি এবাড়ীতে অন্নজল পরিত্যাগ করেছিলেন। রাতটুকু পোহালেই তিনি যাবেন।

কিন্তু তার এখনও অনেক দেরি। এখন রাত বোধ হয় বারোটাই হবে। সরোজিনীর তোরঙ্গটি খুলে নালুবাবু অনেকক্ষণ অবধি এটা ওটা নাড়াচাড়া করছিলেন। এক সময় সেটি বন্ধ ক'রে তিনি উঠে এলেন। তখন সব নিশুতি, কেউ জেগে নেই। তিনি বাইরের দিকে গিয়ে সিঁড়ির তলা দিয়ে ফিরে পার্টিশনের পাশ থেকে সমীরের ঘরের দরজায় খুট খুট ক'রে আওয়াজ করলেন।

একটু পরেই দরজা খুলে সমীর সামনে এসে দাঁড়াল। নালুবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, সমীর, একবার বাইরে আয় ত, শুনে যা—

নালুর পিছনে পিছনে সটান গিয়ে সমীর রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়াল। পথে কেউ কোথাও নেই। নালুবাবু চাপা কণ্ঠে বললেন, পরশু সকালে তোদেব ঠিকে-ঝিয়ের সঙ্গে কিসের গোলমাল বেঁধেছিল রে!

ঢোক গিলে সমীর বললে, মা চেঁচামেচি করেছিলেন, আমি নয়।

কি জন্যে?

সমীর বললে, আমার জামার পকেট থেকে মনিব্যাগটা হারিয়েছে, তাই। গোটা তিরিশেক টাকা ছিল তার মধ্যে।

নালুবাবু বললেন, হ্যাঁ, বুঝেছি। এই নে তোর সেই মনিব্যাগ, টাকাও সব আছে এতে। কিন্তু এরই মধ্যে তোর

বৌদি তোর জন্যে চিঠিও লিখে গেছেন। তোকে তিনি বড় ভালবাসতেন রে, সমীর।

নালুবাবুর গলা ধরে এলো। কিন্তু সহসা সেই অন্ধকার পথের উপর নালুর পায়ের কাছে বসে পড়ে সমীর হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। বললে, দাদা, আমি সব জানতুম, সব জানতুম। কিন্তু পাছে বৌদিদির নামে কেউ কিছু বলে, তাই চুপ করেছিলুম—

শান্ত স্থিরভাবে নালুবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন, পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে ছেলেটা কাঁদতে লাগল।

শব্দশূন্য

টেলিগ্রামটি এসেছিল অবশ্যই কোনও জরুরী খবর নিয়ে। কিন্তু অন্দর-মহলের আচরণ দেখলে একটু যেন আশ্চর্যই হতে হয়।

ডাকপিওন দাঁড়িয়েই রইল কতক্ষণ। বার দুই টেলিগ্রামের কথা বলা সত্ত্বেও কোনোদিক থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

ভিতরে বাসন মাজতে বসেছিল বুড়ি ঝি, সে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে আবার গিয়ে কাজে বসল। বুড়ো রাঁধুনী বামুন খেতে বসেছিল, সে ভ্রূক্ষেপও করল না। পুরনো চাকর হরিপদ সেই যে বাড়ির ভিতর খবর দিতে গিয়েছে, এখনও বেরোয়নি। আশ্চর্য, জরুরী টেলিগ্রাম বিলি করতেও দশ মিনিট লাগে।

অনেকটা সময় গেল বৈকি। তারপর একসময় ধীরে সুস্থে বড়পিসিমা ভিতর থেকে বেরিয়ে বাইরে এগিয়ে এলেন। তাঁর চলনে না আছে চাঞ্চল্য, মুখেচোখে না আছে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ। এ-টেলিগ্রাম কে পাঠাল, কোথা থেকে আসছে এবং তাতে কী লেখা আছে, এ যেন সমস্তই তাঁর জানা।

ডাকপিওনও জানত এই বৃদ্ধা মহিলা সই করতে জানেন না। সুতরাং খামটি বৃদ্ধার হাতে দিয়ে যথারীতি এই কথাটি সে জানিয়ে গেল, ওটা সে নিজেই ঠিক করে নেবে।

খামখানা হাতে নিয়ে বড়পিসিমা কী যেন ভেবে একবার থমকে দাঁড়ালেন। ভ্রূকুঞ্চন নেই, চোখের অভিব্যক্তিটিও একপ্রকার দুর্বোধ্য এবং তাঁর শান্ত মুখের অন্তরালে কোথায় যেন একটি অতল গাম্ভীর্য এ টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও স্থির হয়ে রইল।

আশেপাশে এমন কোনও কৌতূহল নেই যে, দুর্ভাবনার কারণ ঘটবে। সুতরাং হরিপদ যখন তাঁর পথ ছেড়ে সিঁড়ির ধারে সরে দাঁড়াল, বড়পিসিমা পাশ কাটিয়ে ধীর পদসঞ্চারে উপরে উঠে গেলেন।

এ-বাড়িতে হরিপদ সেই তরুণ বয়সে চাকরি নিয়েছিল, এখন তারও চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে।

পুরনো কালের চকমিলান মস্ত বড় বাড়ি। দোতলার মার্বেল পাথর বসান দরদালান পেরিয়ে যাবার সময় বড়পিসিমা আঁচলের চাবি দিয়ে কোণের ঘরের দরজাটি খুললেন এবং কয়েক পা এগিয়ে একটি সুন্দর কাচের টেবিলের চিঠির কেসে খামসুদ্ধ টেলিগ্রামটি গুঁজে রাখলেন। কেউ সেখানে তখন উপস্থিত থাকলে গুণে দেখতে পারত, এই নিয়ে মোট সাত-আটখানা টেলিগ্রাম ঠিক এই জায়গাটিতে ওই ভাবেই জমে উঠেছে। টেলিগ্রাম এখন কথায় কথায়।

বড়পিসিমা শান্ত মুখে আবার বেরিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ করে নিজের মহলের দিকে গেলেন। কিন্তু অত বড় একখানা বাড়ির অন্তঃপুরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আগে তিনি বিশেষ একটি ঘরের দরজার কাছে একবারটি দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন।

সেখানে মেহগিনি পালঙ্কের উপরে সটান চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন অসুস্থ নীলাম্বরবাবু। তিনি জেগে রয়েছেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু স্থির হয়ে রয়েছেন। চোখ দুটি ঢাকা, বোধ করি চোখেরই কিছু অসুখ। বড়পিসিমার সম্ভবত কিছু একটা সন্দেহই হয়ে থাকবে। তিনি ভিতরে গিয়ে খাটের পাশে একবারটি দাঁড়ালেন। তাঁর আন্দাজটি মিথ্যে নয়। নীলাম্বর বেহুঁশ হয়েই রয়েছেন, তাঁর জ্ঞান নেই। বড়পিসিমা পুনরায় স্থির হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে যখন চলে যাবার উপক্রম করছিলেন, সেই সময় একটি সাদা পোশাক-পরা নার্স এসে ঘরে ঢুকল।

বড়পিসিমা এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে ঈষৎ স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে মুখ বুজেই বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সেই নীরবতার মধ্যে প্রশ্ন এবং উত্তর এ-দুটো সমানভাবেই যেন মিলেছিল। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি থেকে একটি কথাই যেন প্রকাশ পাচ্ছে, যা কিছু দৃশ্যমান সমস্তটাই নিত্যনৈমিত্তিক, যেন অনেকটা নিয়মবাঁধা। এ-বাড়িতে মানুষের সাড়াশব্দ যে কম, এটি সেই নিয়মেরই অঙ্গীভূত। বাইরে মস্ত কলকাতা শহরের আধুনিক জন-কোলাহল এই পল্লীর দূর প্রান্ত অবধি হয়ত এসে পৌঁছেচে, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত আজও আসেনি। সেই কারণে এ-বাড়ির অন্তঃপুরটি যেন আজও এক টুকরো প্রাচীন কাল এবং বৈচিত্র্য আজও কোথাও চোখে পড়ছে না। দক্ষিণের ছোট ছাদের আশেপাশে যে কাঠের কোটরগুলির মধ্যে একদল পায়রা বাসা বেঁধে রয়েছে, তারাও

অনেক কালের,—জন্মমৃত্যুর ধারার ভিতর দিয়ে তাদেরও সরায়নি কেউ। মাঝে মাঝে তাদের কণ্ঠের একটা ক্লান্ত রব শুধু এই মস্ত বাড়িখানাকে প্রাণের সাড়ায় একটু চেতিয়ে তোলে মাত্র। নচেৎ দিবারাত্র যেন একটা নিঃশব্দ কৌতূহল এই বিরাট পুরীর উপর তার মস্ত ছায়াটা ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিকালের দিকে এক-একটি ঘরে তালা খুলে মুখ বুজে হরিপদ যখন ঝাড়ামোছার কাজে ব্যস্ত, সেই সময় অন্য একটি ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একটি সুশ্রী তরুণ যুবক বললে, 'আমাকে বলনি কেন বুড়োদা, আজ আবার টেলিগ্রাম এসেছে?'

হরিপদ মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ও আবার বলব কী! হপ্তা-হপ্তাই তো আসে। তুমি তখন কলেজে ছিলে।'

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে ছোকরা ছুটল ভিতর-মহলে। পূবদিকের বারান্দা পেরিয়ে সোৎসাহে একখানা ঘরে ঢুকে চাপা উত্তেজনায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়পিসিমা, খবর শুনেছ তো?'

সেলাইটি সরিয়ে চশমা সমেত মুখখানা তুলে বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, 'সুশান্ত, কখন এলি কলেজ থেকে? কিসের খবর?'

হাসিমুখে অধীর ঔৎসুক্য চেপে রেখে রুদ্ধশ্বাসে সুশান্ত বললে, 'বাঃ, এই তো আজকের টেলিগ্রাম। দাদা আসছে!'

এবার যেন ঈষৎ সচেতন হয়ে উঠলেন বড়পিসিমা। এ-টেলিগ্রামে যে নতুনত্ব ছিল, সেটি তিনি আগে বোঝেননি। এবার যেন তাঁর অটল গম্ভীর মুখের চেহারায় কিছু রক্তের সজীবতা দেখা দিল। শুধু বললেন, 'আসছে? কবে?'

'তোমার এক কথা। কবে কী বলছ? এক্ষুনি—' হাসিখুশি মুখে সুশান্ত বললে, 'দু ঘণ্টার মধ্যে। আমাকে স্টেশনে যেতে বলেছে। গাড়ি নিয়ে আমি চললুম।'

পুনরায় ছুটে চলে যাবার আগে সুশান্ত আরেকবার থমকে দাঁড়াল। বললে, 'আচ্ছা বড়পিসিমা, দাদা বিলেত গিয়েছিল প্রায় আড়াই বছর হতে চলল। এখন কত বদলে গেছে। আমাকে যদি চিনতে না পারে?'

'চিনবে বৈকি বাবা, বড়পিসিমা বললেন, 'হয়ত আগে যাদের চিনতে পারেনি তাদেরও চিনবে।'

কথাটার একটা নিহিতার্থ হয়ত ছিল, ক্ষণকালের জন্য সুশান্ত একবার পিসিমার দিকে তাকাল, তারপব বললে, 'আমি যাই বড়পিসিমা—'

সুশান্ত দ্রুতপদে দরদালান পেরিয়ে চলে গেল। ওদিকের ঘর থেকে বৃদ্ধ নীলাম্বরের নার্স মেয়েটি কেবল একবারটি নিজেব মুখ বাড়িয়ে সংবাদটি জেনে নিল।

ট্রেন এসে যখন হাওড়া স্টেশনে দাঁড়াল, সুশান্ত তখন দুজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে অধীর উৎসাহে দাঁড়িয়ে। একালে দ্রুতগতির যুগে আড়াই বছর সময়টা নেহাত কম নয়। চেনা মানুষও অচেনা হয়ে যায় অল্প সময়কালে, এমন উদাহরণও মেলে। নানা উৎকণ্ঠা নিয়ে সুশান্ত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

হাসিমুখে নামলেন প্রফেসর প্রশান্ত রায়। রং হয়েছে ভয়ানক ফর্সা। এবং চোখে চশমা উঠেছে। সুশান্ত কয়েক পা এগিয়ে যেতেই তিনি সোজা ছোট ভাইটিকে পরম সমাদরে বুকের মধ্যে একেবারে জাপটে ধরলেন। দুজনের মধ্যে বারতের বছর বয়সের তফাৎ। অন্য ছেলে দুটি একে একে এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। প্রশান্ত তাদেরকেও সস্নেহে আদর করলেন।

ভুরু কুঁচকে হাসিমুখে প্রশান্ত বললেন, তুই যে অবাক করলি রে, সুশান্ত। চেহারা চালচলন সবই বদলে গেছে তোর! দাড়ি কামাচ্ছিস কবে থেকে ?

মস্ত হাসির ফোয়ারা ছুটল বন্ধুমহলে। সুশান্ত বললে, দাদা, আমরা জানতুম তুমি ফিরবে জুলাইতে, হঠাৎ মার্চে ফিরে এলে যে ?

বন্ধুরা জিনিসপত্র নামাতে ব্যস্ত ছিল। প্রশান্ত বললেন, বাঃ, তোদের জন্যেই তো ফিরতে হল। খোঁজখবর তেমন বিশেষ পাচ্ছিনে, চিঠিপত্রেরও গোলমাল—ডিগ্রিটা হাতে করে আর আনা হল না। নিউইয়র্কে যাবার কথা উঠেছিল, কিন্তু আমিই গা করলাম না। কেমন যেন আর ভাল লাগছিল না রে।

মালপত্র এমন কিছু সঙ্গে আসেনি। ছোটখাট জিনিসপত্র সমেত সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে ছাত্র দুটি যখন ওদের সঙ্গে এগিয়ে চলল, তখন এক ফাঁকে প্রশান্ত ঈষৎ কৌতূহলী প্রশ্ন করলেন, বাড়ির গাড়ি এনেছিস, না ট্যাক্সি ?

সুশান্ত বললে, না না, তোমার গাড়িই এনেছি। ফুলসিং বাইরে অপেক্ষা করছে।

প্রশ্ন সেটা নয়, আরেকটা। প্রশান্ত বললেন, আমি ভেবেছিলুম তোর বৌদি আসবেন তোর সঙ্গে। তোরা আজকাল খুব ব্যস্তবাগীশ লোক হয়েছিস নাকি ?

না, কই— সুশান্ত একটু বিমনাভাবে জবাব দিল।

বাইরে আসতেই ফুলসিং হাসিমুখে করজোড়ে নমস্কার জানাল। তার পিঠে হাত রেখে প্রশান্ত কুশলপ্রশ্নাদি করলেন। ওদের সঙ্গে ছাত্রদুটিও গাড়িতে উঠে এল। প্রশান্ত গুছিয়ে বসে বাড়ির খবর নিতে গিয়ে শুনলেন, মেজকাকা অতিশয় পীড়িত।

ওঃ সেই জন্যেই—প্রশান্ত ঈষৎ সহজ হয়ে বললেন, ফুলসিং, একটু তাড়াতাড়ি যেও।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ভবানীপুরের মস্ত বাগানবাড়ির ভিতরে গাড়ি এসে দাঁড়াল। হরিপদর সঙ্গে এসে দাঁড়াল বুড়ী ঝি আর ঠাকুর। কিন্তু হৈচৈ সীমাবদ্ধ রইল ওইটুকুর মধ্যেই। মা মারা গিয়েছেন বছর দেড়েক আগে হঠাৎ হৃদরোগে। বাবা অনেক কাল আগেই গিয়েছেন। বিয়ে হয়ে চলে গিয়েছে দুই বোন। সুতরাং অভ্যর্থনা জানাবার লোক এখন কম। প্রশান্ত ওরই মধ্যে ওদের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ করে সোজা ভিতরে গেলেন এবং প্রথমেই যাঁর মুখোমুখি হলেন, তিনি বড়পিসিমা।

হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রশান্ত বললেন, আমাকে একটু তাড়াতাড়িই চলে আসতে হল বড়পিসিমা—

বড়পিসিমার গাম্ভীর্য কাটল না, উদ্দীপনার লক্ষণ দেখা গেল না, শুধু শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, আরেকটু তাড়াতাড়ি এলেই ভাল করতে !

আড়াই বছর পরে এ-ধরনের অভ্যর্থনা ঠিক মানানসই নয়। প্রশান্তর সচেতন মন উৎসুক হয়ে কিছু একটা কৌতূহল নিয়ে ঘুরছিল আশেপাশে। কিন্তু বড়পিসিমা কী বলতে চাইলেন ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা, আগে দেখে আসি মেজকাকাকে।

দ্রুতপদে দরদালান পেরিয়ে প্রশান্ত এলেন নীলাম্বরের ঘরে। ভিতরে আলো জ্বলেছে এরই মধ্যে। সামনেই নার্সকে দেখে তিনি একটু থতিয়ে গেলেন। মহিলাটি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আমি ওঁকে দেখাশোনা করি। প্রায় সারাদিনই থাকি।

কাছে এসে কিছু বোঝা গেল না। নীলাম্বরের দুই চোখ বাঁধা। চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে বটে, কিন্তু ধরেছে অন্য রোগ। ডাক্তার নাকি একপ্রকার জবাব দিয়ে গিয়েছে জানা গেল। নার্স বললেন, বেহুঁশ হয়ে রয়েছেন আজ সতের দিন হল। জ্ঞান ফিরছে না।

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বড়পিসিমা। এবার ধীরে ধীরে বললেন, সময়কালে নীলাম্বর সংসার করলে আমি ছুটি পেতুম।

প্রশান্ত একবার ফিরে তাকালেন। ঘড়ির টিকটিক শব্দটা শোনা যাচ্ছিল বাইরের দরদালান থেকে। আজ এতদিন পরে

বাড়িতে এসে প্রথম দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করে নিতে অনেকটা সময় লাগছে বৈকি। একটু ধীর কণ্ঠে প্রশান্ত বললেন, ডাক্তার কি আসবেন এর মধ্যে ?

জবাব দিলেন নার্স। পরিচ্ছন্ন মুখখানা রোগীর দিক থেকে ফিরিয়ে মহিলা বললেন, অবস্থা একই রকম রয়েছে, সেজন্য ডাক্তার বোধ হয় আজ আর আসবেন না।

প্রশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তাঁর নিজের ঘর। আড়াই বছর পরেও সে-ঘরে ঢুকে অপরিচিত কিংবা নতুন মনে হচ্ছে না। প্রায় আধ ঘণ্টা হল বৈকি, কিন্তু কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল না। ঘরের ছবিগুলো ঝলমল করছে। ধবধবে বিছানাটি ঠিক যেমন থাকা উচিৎ। টেবিলটি সযত্নে গোছানো। একটু আগে কেউ একজন একটি ধূপ জ্বালিয়ে গিয়েছে। ধোওয়া একখানি ধুতি এইমাত্র বার করে আলনায় টাঙানো। নীলাভ আলোটি জ্বালা বাথরুমে। মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত দরজার দিকে একবার তাকালেন। সন্দেহ নেই, পাশেই রয়েছে—যার থাকবার কথা। দীর্ঘকালের ব্যবধানে চক্ষুলজ্জা এসে একটু বাধা দেয় বৈকি। আর তা ছাড়া বিয়ের ছ মাস পরেই তো প্রশান্তকে হঠাৎ চলে যেতে হয়েছিল। সোশ্যাল সায়ান্সে ভালরকমের একটা ডিগ্রি না পেলে তাঁর চলবেই বা কেমন করে। তাঁর অধ্যাপনার জীবনে ওটা কাজে লাগা চাই বৈকি।

উঠে দাঁড়িয়ে একটু গলার আওয়াজ করে হাসিমুখে তাঁর

বলতে ইচ্ছে হল, সামনে এসে দাঁড়াও, লজ্জা কিসের ? পিসিমা কাছাকাছি নেই, দেওর রয়েছে বাইরের ঘরে, আর কেন লুকিয়ে ?

কিন্তু এতক্ষণকার আচরণে এবার একটু যেন অবাক হতে হয়। কাপড়-চোপড় বদলে প্রশান্ত একবার বাইরে এলেন। সমস্ত দরদালানটা শূন্য, সমস্ত বাড়িটা শূন্য। আগ্রহ এবং সমাদরের স্পর্শ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ যেন তাঁর জন্য বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা করে ছিল না। নিজের বাড়িতে তিনি এসে ঢুকলেন যেন অবাঞ্ছিত অতিথি। সবিস্ময়ে প্রশান্ত একবার চারিদিকে তাকালেন।

একখানা ট্রে-র উপর বসিয়ে বুড়ো হরিপদ এবার এক পেয়ালা চা নিয়ে এল। প্রশান্তর জন্মের আগে থেকে লোকটা এ-বাড়িতে কাজ করছে, সুতরাং এমন কোনও প্রশ্ন তাকে করা চলবে না যেটা চটুল শোনায়। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে হরিপদ বললে, খাবার তৈরি হচ্ছে, এখুনি আনব।

নতুন খবর-টবর কিছু আছে, বুড়োদা ?

কই না। হরিপদ আস্তে আস্তে চলে গেল।

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে প্রশান্ত টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরই পাঠানো খান আষ্টেক টেলিগ্রাম পর পর তারিখে সাজান। তাঁর নিজের চিঠিও কয়েকখানা গোছান রয়েছে —বিলেত থেকে লেখা। টানাটা খুললেন প্রশান্ত। ভিতরে কতকগুলো এলোমেলো কাগজ, এবং তাদের দু একখানায় স্ত্রীর

হাতের লেখা অসমাপ্ত চিঠি। হাসি এল তাঁর মুখে। মেয়েছেলে এম-এ পাশ করলে কী হবে, স্বাভাবিক কুণ্ঠা এখনও কাটেনি। স্বামীকে লিখতে গিয়ে ওরই মধ্যে আড়ষ্টতা। ভাষাটা পছন্দ হয়নি, বার বার তাই বাতিল করতে হয়েছে। কাগজপত্রের মধ্যে বন্ধু অতুলচন্দ্রের একখানা পোস্টকার্ড: করকমলেষু, গত কিছু দিন থেকে আপনার খবর নিতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। প্রশান্তর চিঠি পেলুম, এ-বছরে সে ফিরবে মনে হচ্ছে না। আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। আশা করি এতদিনে কতকটা সুস্থ হয়েছেন। ইতি—

সাত আট মাস আগের পুরনো তারিখের কার্ড। কিন্তু তাঁর স্ত্রী লাবণ্য কোনোদিন অসুস্থ হয়েছিল, একথা তাঁকে একটি বারও জানানো হয়নি। স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামীকে জানান হবে না, বিচিত্র বটে। লাবণ্যর ছেলেমানুষি আজও কাটল না।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন প্রশান্ত। এখনও ঘরে ঢুকল না লাবণ্য, সকলের আগে যার ছুটে আসবার কথা। এ-আচরণ একটু অসঙ্গত বৈকি। মিথ্যে নয়, এক বছরের নাম করে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে গিয়েছে আড়াই বছর। তাই বলে চিঠি-পত্র বন্ধ করল লাবণ্য আজ তিন মাস। কই, গেল বছরের মতো এ-বছর লাবণ্য মাথার দিব্যি দিয়ে লেখেনি তো যে তোমার ওই সোশ্যাল সায়ান্সের ডিগ্রির দাম মেয়েমানুষের জীবনে সামান্যই! লিখেছে শুধু এটা ওটা, আজে-বাজে সিনেমার ছবির গল্প,—কিন্তু একথা লেখেনি, তুমি পত্রপাঠমাত্র চলে এসো।

বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রশান্ত। বড়-পিসিমা দ্বিতীয়বার আর খোঁজ নিতে এলেন না। কেন জানি তাঁর গাম্ভীর্য যেন একটু নতুন করে দেখা গেল এতদিন পরে। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভাবছেন, লাবণ্য আছে কাছাকাছি, সে-ই যা হয় দেখাশোনা করছে এতক্ষণ! এবার যেন একটু খটকা লাগছিল।

নিজের মনের হিসাব নিয়ে প্রশান্ত যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে, সেই সময় হরিপদ খাবারের ট্রে নিয়ে উঠে এল। তিনি একবার মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কী করলে? আমার যে এখনও স্নান হয়নি। আমি নিজেই খাবার চেয়ে নেব।

কলের পুতুলের মত হরিপদ যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি আবার ফিরে চলল। হাসিমুখে প্রশান্ত ডাকলেন, অত রাগ করলে কেন বুড়োদা, মাইনে পাওনা বুঝি?

পাই— হরিপদ শান্ত মুখে আবার নেমে গেল।

প্রশান্ত যেন মূঢ়ের মত চুপ করে রইলেন।

লাবণ্য এল না, সুতরাং এতক্ষণ পরে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, এ-বাড়িতে সে উপস্থিত নেই। স্নানাদি সেরে এসে প্রশান্ত প্রস্তুত হয়ে খেতে বসলেন। আহারে রুচি ছিল কম এবং তার কারণও ছিল। বছর খানেক আগে লাবণ্যর এক চিঠিতে একটি ছত্রে ঈষৎ একটু আভাস ছিল এই, বড়-পিসিমার সঙ্গে লাবণ্যর কোথায় যেন একটু বিরোধ ঘটছে। কিন্তু সেই বিরোধের বিস্তারিত বিবরণ কিছু দেওয়া ছিল না। অত্যন্ত বেদনার কথা—

সম্ভবত সেই মতদ্বৈধতা মনোমালিন্যে পরিণত হয়েছে। তবু প্রশ্নটা যাই হোক, মীমাংসা একটু বিচিত্র বৈকি। এত বড় বাড়িতে লাবণ্যর জায়গা হয়নি এবং তাকেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, এটি অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা।

জলযোগ সেরে উঠে দাঁড়াতেই বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সুশান্ত হাসিমুখে ঘরে এসে দাঁড়াল। বললে, দাদা, বাইরের ঘরে বন্ধুরা এসেছেন, তুমি একটু চল।

কেন রে ?

বাঃ, এতদিন পরে তুমি এলে, ওরা তোমার কাছে গল্প শুনতে চায়।

প্রশান্ত সহাস্যে বললেন, বিলেতের সব গল্পই তো পুরনো!

তা কেমন করে হবে ? সুশান্ত অনুযোগ জানাল, তোমার চোখ নতুন, তাই গল্পও নতুন। আসছ তো ?

চল যাচ্ছি—আচ্ছা শোন, সুশান্ত ?

সুশান্ত থমকে দাঁড়াল। প্রশান্ত বললেন, তোর বৌদি বাড়িতে নেই কেন রে ?

সন্ধ্যার আবছায়ায় সুশান্তর মুখের চেহারাটা সহসা স্পষ্ট দেখা গেল না। সে কেবল বললে, ছিলেন তো, এখন নেই।

জবাবটা অদ্ভুত বটে। হঠাৎ প্রশান্ত কী যেন ভেবে চুপ করে গেলেন। লাবণ্য গিয়েছে তার বাবার ওখানে টালিগঞ্জে, সেটি স্পষ্ট। অতএব তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, পিসিমার সঙ্গে কী নিয়ে তোর বৌদির তর্ক বেধেছিল, বলতে পারিস ?

তর্ক ? সুশান্ত বলল, কই, আমি তো কিছু জানিনে ?

মানে, কথা কাটাকাটি হয়েছিল কী নিয়ে তাই জিজ্ঞেস করছি।

কথা কাটাকাটি পিসিমার সঙ্গে ? না তো !

ও— প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা চল, আমি আসছি।

সুশান্ত সোৎসাহে নীচে নেমে গেল। ঘরের ভিতরে এসে প্রশান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, টেবিলের উপর এটা ওটা নাড়া-চাড়া করলেন। কিছু যেন একটা সঠিকভাবে তিনি বুঝবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নানান সামগ্রীর নানা প্রকার ওলট-পালটের ভিতর দিয়েও তাঁর প্রশ্নটার মীমাংসা হল না।

এক সময়ে জামাটা চড়িয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন। তাঁর মুখের উপরে যে ছায়াটা পড়েছে সেটা উত্তেজনার। সেটা চাপা বটে, কিন্তু প্রবল। উগ্র নয়, কিন্তু কঠিন।

বাইরের ঘরে বসে ছিল প্রশান্তর একজন সহপাঠী, এবং দুজন তাঁরই সতীর্থ অধ্যাপক। নরেনবাবুই তাঁদের মধ্যে আগে হৈ-হৈ করে উঠলেন, তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মণিমোহনবাবু। বাস্তবিক, অনেক কাল পরে দেখা বৈকি। না, প্রশান্ত সাহেব হয়নি। বরং একটু বেশীরকম বাঙালী হয়েই ফিরেছে। সিগারেট ছেড়েছে। বাঙলার সঙ্গে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজী মিলিয়ে কথা বলছে না। কথায় কথায় সাহেব বন্ধুর উল্লেখ করছে না।

ওরা সবাই প্রশান্তকে দেখে ভারী খুশী হল।

মণিবাবু বললেন, কেমন সব দেখে এলে হালচাল, দু-এক কথা বল ভাই, একটু শুনি।

খুব হাসাহাসি চলল। প্রশান্ত বললেন, বেশ তো, এক সময়ে বসে বসে সব গল্প বলব, অনেক রকমের কথা আছে। কিন্তু আজ নয়, আরেক দিন। কিছু মনে করো না, আমাকে এখুনি বেরোতে হচ্ছে বিশেষ কাজে। শুধু একটি কথা বলে যাই, কী দেখে এলুম, সে-কথা এখন থাক, কিন্তু যা বুঝে এলুম তার ধাক্কা থেকে আমাদেরও রেহাই নেই।

কী রকম? কেন বল তো?

প্রশান্ত বোধ করি তাঁর পূর্বের উত্তেজনাবশতই বললেন, ঘর আমাদের ভেঙে যাবে, পারিবারিক জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হবে। যা দেখে এসেছ এতকাল, তার কিছু থাকবে না, যা জানার অভ্যাস নিয়ে আছ, তা মিথ্যে হয়ে যাবে।

হাসি-পরিহাসটা যেন হঠাৎ থেমে গেল। প্রশান্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, খ্রীষ্টান বিলেত আর ইউরোপ আজ সংশয়ে আচ্ছন্ন।

কিসের সংশয়?

ঈশ্বর-সংশয়। গির্জায় রস নেই, পারিবারিক জীবনে বাঁধন নেই, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা পাওয়া যাচ্ছে না, সন্তান-সন্ততির জন্য নৈতিক দায়িত্ব বাপ-মা আর নিতে চাইছে না। বাইরের দিকে দেখে এসো, প্রকাণ্ড সম্পদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু সৃষ্টি ছারখার হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। এই সর্বনাশের

মধ্যে নতুন সৃষ্টির বনেদ কোথায় উঠছে কেউ জানে না, কিন্তু এই সাংঘাতিক ধাক্কায় আমাদেরও এবার রেহাই নেই। এই ভাঙনে আমাদেরও কিছু থাকবে না।—আচ্ছা ভাই, আজ আমাকে একটু ছুটি দাও তোমরা।

ফুলসিং গাড়ি নিয়ে বাইরে প্রস্তুত হয়ে ছিল। প্রশান্ত বেরিয়ে এসে সটান গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বন্ধুরা পিছন দিকে স্তব্ধ হয়ে রইল।

উত্তেজনাটা কমেনি, কিন্তু প্রশান্ত বরাবরই সংযতবাক। ছাত্ররা তাঁকে পছন্দ করে বোধ করি বাকস্বল্পতা এবং মিষ্ট ব্যবহারের জন্য। গাড়ি ছাড়বার পর তিনি আপাত শান্ত কণ্ঠে বললেন, টালিগঞ্জের ও-বাড়িতে নিয়ে চল, ফুলসিং।

মনে তাঁর নানা প্রশ্ন ছিল এবং কৌতূহল ছিল আরও বেশী। টেলিগ্রাম ওভাবে সাজান থাকে কেন, টানার ভিতরকার কাগজপত্র কেন অমন এলোমেলো, পিসিমার ওই অবিচল গাম্ভীর্য এবং অমনভাবে নিস্পৃহ উদাসীন থাকা, তার সঙ্গে হরিপদর এবম্বিধ আচরণ—সমস্তটার পিছনে কেমন যেন দুর্বোধ্য রহস্য থেকে যাচ্ছে। ছেলেমানুষ সুশান্তকে যেটুকু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তার বেশী আর তাকে নাড়াচাড়া করা চলবে না। কিন্তু আড়াই বছর পরে লাবণ্যর সঙ্গে এবার যখন দেখা হবে, তখন প্রথম সম্ভাষণটা কী রকম দাঁড়াবে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পিত্রালয়ে সে গিয়েছে, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে না দিয়েছে টেলিগ্রামের জবাব, না লিখেছে বিস্তারিত পত্র। একবারও

বলেনি যে, সে শ্বশুরবাড়িতে নেই এবং ঠিকানা বদলেছে। একটিবারও এই কথা লেখেনি যে, যে-বাড়িতে তার নৈতিক এবং ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকার কথা, সেখানে তার ঠাঁই হয়নি।

প্রশান্তর মনে উত্তেজনা আরও ছিল এই কারণে যে, সে এখনি—লাবণ্য যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন,—তাকে নিয়ে ভবানীপুরের বাড়িতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর জায়গা হবে না স্বামীর নিজের বাড়িতে, এত বড় অসামাজিক ঘটনা সবাই মিলে কেমন করে বরদাস্ত করে নিয়েছে?

গাড়ি এসে দাঁড়াল টালিগঞ্জের বাড়ির সামনে। নেমে এলেন প্রশান্ত। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই ডান দিকে পড়ে বাইরের ঘর। সেখানে ছোট শ্যালক শ্রীমান অজিত টেবল-ল্যাম্পটি জ্বেলে একমনে একটি বই পড়ছিল। এবার সে এম-এ দেবে। প্রশান্তকে দেখামাত্রই সে সোৎসাহে বলে উঠল, একটুও চমকাইনি, একটু আগেই সুশান্ত ফোন করে খবর দিয়েছে। বলতে বলতে হাসিমুখে সে উঠে এসে প্রশান্তর পায়ের ধূলো নিল। সহাস্যে দুই হাতে তাকে টেনে নিয়ে প্রশান্ত বললেন, তোমার জন্যে কী কী এনেছি দেখলে চমকে উঠবে!

দেখতে দেখতেই ভিতরে সাড়া পড়ে গেল। ফ্রকপরা ছোট্ট শ্যালিকাটি দৌড়ে এল এবং সেই গতিতেই প্রশান্ত তাকে একেবারে কোলে তুলে নিলেন। পরে বললেন, তোমার বোনেরা কেমন মন্তর জানে দেখছ তো? অসময়ে আমাকে ফিরিয়ে আনল।

অজিত বললে, দেখছি তাই। আপনার তো ফিরবার কথা ছিল জুলাই মাসে!

দাঁড়াও, সব খবর একে একে নেব। প্রশান্ত এতক্ষণ পরে এবার সহজ ও স্বাভাবিক হলেন। বললেন, তোমাদের বাড়িটাকে শূন্য মনে হচ্ছে। মিনুর বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আর আমাকে খাতির করবে কে বলো?

অজিত হাসিমুখে বললে, কেন, এই আপনার ছোট শ্যালী?

ছোট মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে প্রশান্ত বললেন, উঁহু, না, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কমে গেছে অজিত। এম-এ পড়লে মাথা গুলিয়ে যায়। আরে, ফ্রকপরা শ্যালীতে রং থাকলেও রস কম। কী বল, চিনু?

চিনু সোৎসাহে প্রশান্তর গলা জড়িয়ে বললে, আজ কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে এখানে।

এর পরে শ্বশুরবাড়ির অভ্যর্থনা কী প্রকার হওয়া উচিৎ, সে-বর্ণনা বাহুল্য। ঘণ্টা দুই ধরে শাশুড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা ইত্যাদি অন্যান্য কুটুম্বাদির আসরে বসে প্রশান্তকে অনর্গল আত্মকাহিনী এবং বিদেশের গল্প করে যেতে হল। কিন্তু সমস্তটার আড়ালে উদ্‌গ্রীব চক্ষু যাকে সন্ধান করে ফিরছে, তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে এক সময়ে প্রশান্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। আহারাদি সেরে কোন এক ফাঁকে তাকে বলতে হল, এবার আমাকে যেতে হবে। বাড়িতে মেজকাকার অবস্থা ভাল নয়, ডাক্তার একরকম জবাবই দিয়ে গেছে। এবার আমি উঠব।

শাশুড়ী এর মধ্যে কখন যেন উঠে কোথায় সরে গিয়েছেন। শ্বশুর মহাশয় গল্পগুজব সেরে নিজের ঘরে গিয়ে কী যেন লেখা-পড়ার কাজে বসেছেন। এবার ছোট শ্যালীকে নানাভাবে সমাদর জানিয়ে তার বাঁধন কাটাতে হল। প্রশান্ত আবার আসবে বৈকি, হ্যাঁ, যখন তখন আসবে। অতঃপর এক সময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসবার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কী হে অজিত, তোমার ছোড়দি কোথা? দেখছিনে যে?

ছোড়দি! দাঁড়ান, মাকে ডেকে দিই। অজিত ছুটে ভিতরে যাচ্ছিল, কিন্তু আনা-গোনার পথের পাশেই মা দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিলেন!

অসীম কৌতূহল নিয়ে দু পা প্রশান্ত এগিয়ে গেলেন। সোজা সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কী বলুন তো?

শাশুড়ী জবাব দিলেন না, কিন্তু আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। প্রশান্তর পায়ের তলাকার ভূমি যেন কেঁপে উঠছিল। তিনি বিমূঢ় এবং হতবাক। আর কিছু বলবার নেই, কিছু জানবারও নেই। লাবণ্য মারা গিয়েছে।

শাশুড়ী একসময়ে মেঝের উপরেই বসে পড়লেন এবং অজিত ও চিনু তার আগেই সেখান থেকে সরে গিয়েছিল। স্তব্ধ হয়ে প্রশান্ত সেইখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর এক সময়ে স্খলিত পায়ে বাইরে এসে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

কী প্রকার অসুখ হয়েছিল, উপযুক্ত চিকিৎসার ত্রুটি ছিল কি না, মৃত্যুর তারিখটা ঠিক কবে এবং অন্তিমকালে কী প্রকার অবস্থা ঘটেছিল, এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর। সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই, লাবণ্যর মৃত্যু ঘটেছে।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে বসে চোখে জল আসছে না কেন, সেটি প্রশান্ত বিশ্লেষণ করছিলেন। ছয় মাস মাত্র বিবাহের পর আড়াই বছরের জন্য যে-ব্যক্তি বিদেশ চলে যায়, তার চোখে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাড়াতাড়ি জল আসে কি না, এটি ভেবে দেখা দরকার। বন্ধু হিসাবে বন্ধুকে জানা যায় অল্পকালের মধ্যে, স্ত্রী হিসাবে জানতে গেলে আরেকটু সময় লাগে। ওই ছয় মাসের মধ্যে অধ্যাপনার কাজে, পরীক্ষাদির তদ্বিরে এবং বিদেশযাত্রার হুজুগে তাঁর অন্যমনস্ক মন বন্ধুকে আবিষ্কার করেছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীকে সন্ধান করবার সময় পায়নি। আজকের সংবাদটিতে ভয়ানক একটা আঘাত রয়েছে বটে, কিন্তু নিবিড় বেদনায় শোকার্ত্ত চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠতে চাইছে না।

ফুলসিং, না না ওদিকে নয়—সোজা চল ধর্মতলার দিকে।

ফুলসিং গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে উত্তরদিকে চলল। হঠাৎ প্রশান্তর খেয়াল হল, শাশুড়ীর চোখের জলের মধ্যে মৃত্যুসংবাদটি নির্ভুল ছিল কী? বড়পিসিমার গাম্ভীর্যে, সুশান্তর জবাবে, হরিপদর মৌনতায়, চিনু আর অজিতের সমাদরে, শ্বশুর মহাশয়ের শান্ত ঔদাস্তে—মৃত্যুর সঙ্কেতটা কি সঠিক ছিল?

প্রশান্ত ছুটছেন কোথায়? কেন ছুটছেন? কার কাছে? কেউ তো তাঁর জন্য কোথাও অপেক্ষা করে নেই?

রাস্তার পাশে একবার গাড়ি রাখ তো ফুলসিং? প্রশান্ত সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন।

ততক্ষণে চৌরঙ্গী এসে পড়েছিল। ময়দানের দিকে বেঁকে এক জায়গায় এসে ফুলসিং গাড়ি রাখল। প্রশান্ত বললেন, তুমি নেমে যাও, পাঁচ মিনিট পরে এসো।

ফুলসিং নেমে চলে গেল কিয়দ্দুর এবং এদিক ওদিক ঘুরে সে যখন ফিরে এল, দেখল, প্রশান্ত ঠিক একইভাবে গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে বসে রয়েছেন। ফুলসিং গাড়িতে এসে উঠতেই তিনি বললেন, অতুলবাবুর বাড়িতে চলো।

ধর্মতলায় কি যাব না?

না—অতুলবাবুর ওখানে।

চৌরঙ্গী থেকেই পূর্বদিকের পথে গাড়ি ঘুরে চলল। বেশী দূর নয়। দেখতে দেখতেই একটি ফটকের ভিতরে এসে গাড়ি ঢুকল। রাত সাড়ে নটা বাজে। মোটরের হর্ন শুনে একটি যুবতী মেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। প্রশান্ত হাসিমুখে গলা বাড়িয়ে বললেন, এই যে মঞ্জু, কেমন আছ তোমরা?

আপনি কবে ফিরলেন, প্রশান্তদা?

আজই ফিরেছি বিকেলে। অতুল আছে নাকি?

মঞ্জু বললে, আপনি বোধ হয় খবর পাননি, আজ কুড়ি দিন

হল দাদা গিয়েছেন মাদ্রাজে নতুন চাকরি নিয়ে। বৌদিও সঙ্গে গেছেন।

প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা, নতুন খবর বটে! চাকরি নিলে শেষ পর্যন্ত তাহলে? বেশ মোটা মাইনে মনে হচ্ছে।

হাসিমুখে মঞ্জু বললে, লাবণ্য কই? গাড়িতে দেখছিনে তো?—নামুন গাড়ি থেকে?

না ভাই—প্রশান্ত বললেন, আরেকদিন আসব। তাছাড়া রাতও হয়ে গেছে, ফিরতে হবে এক্ষুনি। আচ্ছা, আসি।

মঞ্জু নমস্কার জানাল। ফুলসিং গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল। কিন্তু আন্দাজ একশ গজ পর্যন্ত গিয়ে প্রশান্ত হঠাৎ বললেন, আরে, আরে ফুলসিং, দাঁড়াও একটু—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দাঁড়াও—

গাড়ি থামিয়ে প্রশান্ত নেমে পড়লেন। পুনরায় বললেন, থাক এটুকু আমি হেঁটেই যাচ্ছি। শোনো, গাড়ি নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও। এখানে আমার দেরি হবে।

আচ্ছা, হুজুর—ফুলসিং আবার গাড়ি ছেড়ে দিল, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না গাড়িখানা চোখের সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেল, প্রশান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অতঃপর তিনি অন্য পথে ঘুরলেন। সে-পথ মঞ্জুদের বাড়ি দিকে নয়। একা হাঁটলে নিজের সঙ্গে কথা চলে। হাঁটতে হাঁটতে চললেন তিনি। পথের এক একটা আলো গুণে গুণে তিনি হাঁটছিলেন। পাঁচটা আলো পেরোবার পর তিনি বাঁদিকে

ফিরলেন। সে-পথেও তিনি গেলেন অনেক দূর। কেন যাচ্ছেন সেটি অর্থহীন। মাত্র তিনটি রাত্রি আগে বিলেতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছিল, জীবনটা একদিক থেকে মস্ত সম্পদে পরিপূর্ণ। আজ কিন্তু সবটা মিলিয়ে বড় নতুন লাগছে। তীব্রভাবে নতুন, অস্বাভাবিক রকমের বিস্ময়কর।

হঠাৎ অদূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। কালো রংয়ের একখানা মোটর ছুটে যাচ্ছিল অতি দ্রুত, বোধ হয় কেউ চাপা পড়ল। হৈ-হৈ রব উঠল এখানে ওখানে! গাড়িখানা থামল না, অন্ধকার পথ পেয়ে পালিয়ে গেল পূর্ণ গতিতে। না, কিছু হয়নি, লোকটা মরেনি। অন্য দুটি লোক তাকে ধরে ফুটপাতে নিয়ে গেল। যাক, সামান্য আঘাত পেয়েছে একখানা হাতে। প্রশান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর অধ্যাপক-মন বোধ হয় এই কথাটা জানল, দুর্বিপাক জীবনেরই একটা স্বাভাবিক অঙ্গ, ওটাও স্বীকার্য। মৃত্যুও জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য, ওটা একই সঙ্গে মানিয়ে না নিলে চলবে না।

সামনে দিয়ে একখানা ট্যাক্সি পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি থামালেন। অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে এবার তিনি বাড়ির পথ ধরলেন। বাড়ি এখান থেকে মাত্র মিনিটকয়েকের পথ। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পৌঁছে গেল।

ফটকের বাইরে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে তিনি নামলেন। অর্থহীনভাবে তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যেন অপরাধী। তাঁরই সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদক্লিন্ন, যেন তিনি নিজেরই হাতে বিকাল, সন্ধ্যা

ও রাত্রি ধরে নিজের গায়ে কাদা মেখেছেন। অন্ধকার বাগানটুকু তিনি পেরোচ্ছিলেন পা টিপে টিপে, পাছে শব্দ হয়। গাছের ছায়ারা তাঁকে লক্ষ্য করছে, ধিক্কার দিচ্ছে কেউ যেন নিঃশব্দে অন্ধকারের ভিতর থেকে। বাড়ি নয়, বিষাক্ত পিশাচপুরীর মধ্যে এসে প্রশান্ত ঢুকলেন।

বাইরের ঘরে সুশান্ত তখনও বসে একখানা খবরের কাগজ ওলটাচ্ছিল। দাদাকে দেখে হাসিমুখে সে বললে, সবাই জেনেছে তুমি ফিরে এসেছ। এই ছ্যাখো দাদা, আজকের কাগজে তোমার ছবি, আর একটা রাইট-আপ বেরিয়েছে। সকালের দিকে আমি লক্ষ্য করিনি······মেজকাকার বাড়াবাড়ি অসুখ কিনা—

ছোট ভাইয়ের মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে প্রশান্ত ঠিক যেন কেঁদে উঠলেন, এত রাত হয়েছে···এখনও ঘুম পায়নি তোর?

অসীম করুণায় তাঁর কণ্ঠ যেন কম্পমান। সুশান্ত বললে, ওপরে যেতুম, কিন্তু তোমারই জন্যে বসেছিলুম। কে যেন একজন টেলিফোন করছিলেন তোমাকে,—আমার যেন মনে হল অতুলদার বোন মঞ্জুদি!

একখানা চেয়ারে বসে প্রশান্ত একটু উদাসীন কণ্ঠে বললেন, কিছু বললে?

না, আমায় কিছু বলেনি। নামও বললে না। শুধু একটা টেলিফোন নম্বর লিখে নিতে বললে। এই যে টুকে রেখেছি।

তুমি এসেই ফোন করবে, এই অনুরোধ। সুশান্ত কাগজের টুকরোটি দাদার হাতে দিল, তারপর বললে, আচ্ছা দাদা, তুমি বসো, আমি ওপরে যাচ্ছি।

চুপ করে বসে রইলেন প্রশান্ত। চোখ দুটো ছিল তাঁর সামনের দেওয়ালের দিকে, সেখানে যেন একটা অসীম কালের নৈরাশ্য আঁকা। সেইদিকে তাকিয়ে বোধ করি তাঁর অনেকক্ষণ কেটে যেত, কিন্তু একসময় এসে ঢুকল হরিপদ। পিছন থেকে অতি মৃদু কণ্ঠে বৃদ্ধ প্রশ্ন করল, খাবার দিতে বলব, বড়দা?

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন প্রশান্ত। চিনতে পারলেন না তিনি এই হরিপদকে—যে ব্যক্তি তাঁর চিরকালের চেনা। এও যেন অনন্ত রহস্যে ঢাকা। শুধু স্বল্পকথায় জবাব দিলেন, আজ খাব না।

হরিপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কাগজের টুকরোটা এতক্ষণ আঙুলের মধ্যে মুড়ি পাকিয়ে প্রশান্ত দুই আঙুলে রগড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ সচেতন হয়ে তিনি সেটি ধীরে ধীরে খুললেন এবং নম্বরটি দেখে টেলিফোন করলেন। ওদিক থেকে তখনই কোনো এক মহিলার কণ্ঠের সাড়া এল, আপনি কে কথা বলছেন?

প্রশান্ত রায়।

ও দেখুন, আমাকে আপনি চিনবেন না। আজ খবর পাওয়া গেল, আপনি বিলেত থেকে ফিরেছেন। আমি আপনার স্ত্রী

লাবণ্য রায়ের এখান থেকেই বলছি। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কোথায়? প্রশান্ত যেন আর্তনাদ করে উঠলেন।

ঠিকানাটা লিখে নিন, আমি বলে যাচ্ছি।

বলুন?

অতি পরিষ্কার কণ্ঠে মহিলা যে-ঠিকানাটি বলে দিলেন, তারই কাছাকাছি প্রশান্ত আজ গিয়ে পড়েছিলেন। এবার শুধু জড়িত রুদ্ধস্বরে বললেন, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রশান্ত একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘর ছেড়ে সোজা বেরিয়ে পড়লেন। ফুলসিংয়ের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করবার সময় তাঁর ছিল না। অন্ধকারেই তিনি একপ্রকার দৌড় দিলেন ফটক পেরিয়ে, এবং বড় রাস্তায় এসে প্রথম যে ট্যাক্সি পেলেন তাইতেই উঠে পড়লেন।

মিনিট পনেরোর উৎকণ্ঠা। খুঁজে খুঁজে একটি বাড়ির সামনে এসে প্রশান্ত গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। গাড়ি চলে গেল। পথের উপরেই প্রায় দরজা এবং ভিতরে ঢুকলেই বাঁ-হাতি সিঁড়ি ঘুরে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। প্রশান্ত সোজা তিনতলায় গিয়ে উঠলেন যেমন নির্দেশ ছিল। কলিং বেল টিপতে না টিপতেই দরজা খুলে গেল এবং ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে একটি মহিলা সামনে এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মিঃ প্রশান্ত রায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভারী আনন্দের কথা। আসুন ভেতরে, এই যে এই ঘরে এসে বসুন।

কোথায় যেন কী একটা কটু ঔষধের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মহিলার নির্দেশমতো একটি ঘরে এসে প্রশান্ত বসলেন। পুনরায় হাসিমুখে মহিলা বললেন, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব মনে করেছিলুম, তা আর হল না। আমাকে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে। লাবণ্য রইল। কাল সকাল নটার পর আবার আমি আসব। নমস্কার—

মহিলাটি বেরিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

সবুজ আলোটা ঘরের মধ্যে জ্বলছে অনেকটা মায়াপুরীর মতো। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সব কিন্তু যেন হরিৎ রহস্যের ছায়া। মিনিট পাঁচসাত পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সামান্য ঘোমটা মাথায় টেনে যে-মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকল সে অস্পষ্ট নয়,—চেনা-অচেনায় মিলিয়ে তারই নাম লাবণ্য। প্রশান্ত উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না। লাবণ্য মৃদুগতিতে এসে মেঝের উপরে বসে হেঁট হয়ে প্রণাম করল, কিন্তু পায়ে হাত দিল না। বিলাতযাত্রার দিন একদা সে পায়ে হাত বুলিয়েই প্রণাম করেছিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলেন, ও মেয়েটি কে?

লাবণ্য যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, অথবা তলিয়ে গিয়েছিল কোনও

অতলস্পর্শ জলধির মধ্যে। এবার আস্তে আস্তে উঠে এল। বললে, বন্ধু।

একসঙ্গে পড়তে বুঝি?

একটি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে লাবণ্য অনেকটা সময় নিল। বললে, হুঁ।

প্রশান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে গেলেন। পরে বললেন, তোমার শরীর কি অসুস্থ?

না।

উভয়ে আবার নিস্তব্ধ দীর্ঘকাল। উভয়ের মাঝখানে বিরাট কোনো প্রাচীর, অথবা বিস্তীর্ণ কোনো একটা ব্যবধান,—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু সেটি দূরতিক্রম্য। এক সময় প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করলেন, তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে খুব, লাবণ্য?

মৃদু জড়িত কণ্ঠে লাবণ্য জবাব দিল, ঘুমের ওষুধ খেয়েছি।

তুমি কাঁদছ কেন? আজ কি কাঁদবার কথা ছিল? একটু হেঁট হয়ে প্রশান্ত তার কাঁধের উপর একটি হাত রাখলেন।

হঠাৎ কাঠ হয়ে গেল লাবণ্য। তারপর ধীরে ধীরে একখানা হাত বাড়িয়ে প্রশান্তর হাতখানা সরিয়ে দিল। একটু বিস্ময়াহত হলেন প্রশান্ত। পরে তিনি গলা পরিষ্কার করে বললেন, লাবণ্য, খুব অস্পষ্ট এখন আর মনে হচ্ছে না। কিন্তু তোমার চোখের জলে অনেক কালের পুরনো ধারণা একটু যদি ফিকে হয়, মন্দ

কি? যাও, ঘুমিয়ে পড়গে, ঘুম তোমার দরকার। আমি এঘরে রইলুম আজকের মতন।

আরেকবার আনম্র প্রণাম জানিয়ে তন্দ্রাহতা লাবণ্য ধীরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন অত বেলায় প্রশান্তর ঘুম ভাঙলেও ওঘরে লাবণ্য তখনও জাগেনি। বেলা নটার পর যথারীতি সেই মহিলাটি এসে ঘরে ঢুকে লাবণ্যর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা পেলেন, কিন্তু সেই ঘুম কেউ কোনোদিন ভাঙাতে পারে নি।

প্রশান্ত পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার একটি শিশি তুলে দেখিয়ে বললেন, এই ট্যাবলেটগুলো একই সঙ্গে পর পর খেয়েছেন, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মুখের রং ফিকে সবুজই হয়ে যায়—আপনি আর মিথ্যে চেষ্টা করবেন না।

মহিলাটি অশ্রুসজল চক্ষে চেয়ে বললেন, মেয়ে মানুষের জীবনে য়্যাকসিডেণ্ট কি হতে নেই? মরবে তাই বলে?

প্রশান্ত শান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, য়্যাকসিডেণ্ট হয় বৈকি। কিন্তু অনেকে আঘাতের চেয়ে আতঙ্কে মরে!

শিকার

ছেলেমানুষের মনে যে-দাগ পড়ে সেই দাগ কোনোদিন মোছে না। মার খেলেও যে-দাগ, ভালোবাসা পেলেও সেই দাগ। ও-তুটো সমানভাবেই গাঁথা থাকে।

তরুদিদির বাঁকা চোখে থাকতো খরদৃষ্টি—কিশোর বালক আন্দুর নীরোগ স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সেই দৃষ্টি ভ'রে উঠতো ঈর্ষায়। আন্দুর গা ছমছম ক'রে উঠতো ভয়ে। সে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যেতো এই দূর-সম্পর্কীয়া দিদির সামনে।

চিরকালের জন্য এই দাগ ব'সে গেছে।

তরুদিদি জমিদারের বউ। বাপের বাড়ীটি হোলো গরীবের ঘর,—বিধবা মা শুধু আছেন। বছরের মধ্যে তিন-চার বার তরুদিদি তাঁর রুগ্ন এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে উঠতেন ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য। ওদের মধ্যে একটি মেয়ের আবাল্য মৃগীরোগ, এবং কোলের ছেলেটির আজন্ম পুঁয়ে রোগ। সুস্থ সন্তান কা'কে বলে, তরুদিদি সেটি জানতেন না। রূপ এবং স্বাস্থ্য ছাড়া তাঁর জমিদারিতে আর সবই ছিল।

কিন্তু এই তুটি অভাবের একটি পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ ছিল তাঁর

নিজেরই সর্বাঙ্গে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গে এবং একথা বলা চলে,—প্রত্যঙ্গেও, ভারি ভারি অলঙ্কার কম-বেশী দুই সের সোনারূপোয় ভরা থাকতো, এবং রাত্রের দিকে কোলের শিশুটি কেঁদে উঠতো বার বার তাঁর সোনার গহনার খোঁচায়। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক কি প্রকার, সেটি খুব স্পষ্ট নয়।

গহনার ভারে তিনি হাঁপাতেন,—কেন না মানুষটি হোলেন স্থূলাঙ্গ ও খর্বকায়া,—আর তাই দেখে দরিদ্র পরিবারের সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো।

সেবার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তিনি বাপের বাড়ীতে ঢুকেই প্রথমে কঠোর সম্ভাষণ করলেন তাঁর বিধবা ও নিরুপায় জননীকে,—এতটুকু বিবেচনা নেই তোমাদের ঘটে? আমার যে চর্বির ব্যামো, মনে নেই তোমাদের? একজন লোক পাঠাতে পারোনি ইস্টিশানে? বাড়ীশুদ্ধ আক্কেলের মাথা খেয়েছো?

মা বললেন, তেমন তো কেউ নেই, কে যাবে মা?

কে যাবে! মরেছে বুঝি সব? আগে বললেই পারতে! আমি না হয় নাই আসতুম।

ম্লান হাসি হেসে মা চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তরুদিদির এই উগ্র কঠোর প্রথম সম্ভাষণে বাড়ীসুদ্ধ সবাই হতবাক।

এবারেও তাঁর সঙ্গে আছে সেই ঝিয়ের মেয়েটা। ওর নাম হিমি। এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে মহলে সে খুব পরিচিত। মেয়েটা তরুদিদির দুচোখের বিষ হ'লেও বার বার সঙ্গে আসে, এবং তারই জন্য তরুদিদির অবস্থানকালটি বেশ সরগরম থাকে। হিমি

হোলো ওঁদের গায়ের এক প্রজার মেয়ে, বছর এগারো বারো বয়স, এবং অতিশয় স্বাস্থ্যবতী। বস্তুত, ওর স্বাস্থ্যের কাঠিন্যই হোলো যেন ওর অপরাধ। হিমি এসে পৌঁছলেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে মিলে যায়, এবং তরুদিদি ক্রুদ্ধ বিদ্বেষে সেটি পর্যবেক্ষণ করেন। মেয়েটা বিশেষ কারো অপ্রিয় ছিল না।

তরুদিদির ছেলেমেয়েদের চেহারায় জমিদারগোষ্ঠীসুলভ কোনও ছাপ নেই। সবগুলিই কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কাল ও হৃতশ্রী। প্রথমেই খাবার জন্য তারা বাহানা ধরলো,—কেউ শুয়ে পড়লো আনাগোনার পথে, কেউ ঢুকলো রান্না-ভাঁড়ার ঘরে, কেউবা নোংরা ক'রে বসলো একেবারে সকলের মাঝখানে। কিন্তু সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রথমেই ছুটে এসে তরুদিদি হিমির গালে ঠাস কবে এক চড় বসিয়ে দিলেন,—হারামজাদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস? ওদের সামলাতে পারিসনে?

আন্দু ব'লে উঠলো, ওর কোনো দোষ নেই, তরুদিদি!

থাম্, ছোট মুখে বড় কথা কসনে! তরুদিদি কঠোর কণ্ঠে এক হাঁক দিলেন। আন্দু কাঁচুমাচু হয়ে সেখান থেকে স'রে গেল।

মেয়েটাই যে কেবল বিনা দোষে মার খেলে তাই নয়, ওই চপেটাঘাত পড়লো সমস্ত বাড়িখানারই গালে,—অন্তত ওর প্রতিধ্বনি সেই কথাটাই প্রকাশ করলো। সেই কারণে হিমির উপরে এই নির্বিচার লাঞ্ছনাটা সবাই যেন একটি মুহূর্তে নিজেদের মধ্যেই ভাগ ক'রে নিল।

হিমি কিন্তু একটু অন্য ধরনের। মার খেলে সে ভ্রূক্ষেপ করে না এতটুকু। বিড়ালকে মারলে বিড়াল স'রে যায় বটে, কিন্তু নিজের হাতে লাগে। হিমির দেহ পাথরের মতো শক্ত আর নিরেট। এর আগে দেখতে পাওয়া গেছে ঠাণ্ডায় বর্ষায় ওর কিছু হয় না। অযত্নেই মেয়েটা সুস্থ থাকে। আধ সের চালের পান্তা ভাত খায় এক খাবল নুন আর তেঁতুল দিয়ে। যেখানে সেখানে প'ড়ে লোহার মতো ঘুমোয়। ডাকলে বরং পাড়ার লোক জাগে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

মনিবের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থেকে তাঁকে তুষ্ট রাখাই ভৃত্যের কর্তব্য,—কিন্তু হিমি ছিল অন্যরকম, এটি তরুদিদি অনুভব করতেন। তাঁর মনে হোতো, হিমি তাঁকে গ্রাহ্য করে না। রাগও ছিল সেইখানে।

কোলের ছেলেটার পুঁয়ে রোগ, কিন্তু তাকে ভুলিয়ে শান্ত রাখা ছিল শিবেরও অসাধ্য। তবু ওই কাজটিই ছিল হিমির। আড়াল থেকে আন্দু সকৌতুকে দেখতো, কাঁদুনে ছেলেটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে হিমি তাকে কাঁদাচ্ছে আরো বেশী, এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটাকে টিপে টিপে দু'এক ঘা বসিয়েও দিচ্ছে, আবার চেঁচালেও মুখ টিপে ধরছে! একসময় ছুটতে ছুটতে আসেন তরুদিদি। চীৎকার ক'রে বলেন, আমাকে ভাত তুলতে দিবিনে মুখে? কেন তুই ওকে ভুলিয়ে রাখতে পারিসনে? বদমাইস নচ্ছার—!

হিমি গোঁজ গোঁজ ক'রে বলে, অত কাঁদলে আমি কি করবো ?

ফের আমার মুখের ওপর কথা ?—তৎক্ষণাৎ তরুদিদি রাগে অন্ধ হয়ে যান্ এবং পলকের মধ্যে একপাটি জুতো এনে হিমির পিঠে সজোরে বসিয়ে দেন্।

হিমি একটু নড়ে না, কাঠের মতো ব'সে থাকে। ছেলেটা আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। আন্দু গা ঢাকা দিয়ে চ'লে যায়।

তরুদিদির উচ্চকণ্ঠের দাপটে বাড়িসুদ্ধ সবাই তটস্থ।

ওরই মধ্যে হিমি আবার একটু খামখেয়ালীও বটে। কাজ করে যখন, তখন সে অক্লান্ত। বাজার করে, ওষুধ আনে, নোংরা কাঁথা কাচে, বাসন মাজে, এঁটো পাড়ে, জল তোলে, রান্নাবান্নার যোগাড় দেয়, ঘরদোর ঝাঁটায়। কিন্তু তার মেজাজ যদি ভালো না থাকে, তাহলে সেদিন আর রক্ষা নেই। বাজার থেকে পচা মাছ কিনে আনবে, ওষুধের শিশি ভেঙ্গে আসবে, বাসনপত্র ফেলবে ঝনঝনিয়ে, জলের বালতি কাৎ করবে শোবার ঘরে, রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা ফেলে রাখবে,—সেদিন ওকে দিয়ে আর কোনো কাজ করাবার উপায় থাকবে না। ছোট ছেলেটা যদি সেদিন কেঁদে কেঁদে ককিয়েও যায়, হিমি ভ্রূক্ষেপও করবে না, বরং নিজে এক সময় ছাদের চিলেকোঠায় গিয়ে চুপটি ক'রে বসে থাকবে। আর নয়তো সেদিন এমন ঘুম ঘুমোবে যে, একেবারে

পাথরের ডেলা। সকালের দিকে শো'বে, বিকেলেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু আশ্রিত-অনাথা ঝিয়ের এই স্পর্ধা তরুদিদি বরদাস্ত করবেন, তেমন মানুষ তিনি নন্। কাঠের চেলা নিয়ে তিনি একসময় উঠে যেতেন সেই চিলেকোঠায় এবং কোনো বিচার বিবেচনা ক'রে দেখার আগেই তিনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে মেয়েটাকে সায়েস্তা করতে আরম্ভ করতেন। হিমি অনড় হয়ে মার খেতো।

আন্দু চুপ ক'রে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকতো। আশ্চর্য, এত মারধোর, কিন্তু মেয়েটা কোনোদিন কাঁদলো না। লোহার মতো কঠিন নিশ্চল হয়ে থাকতো, আর পিঠের ওপর দিয়ে গাছ-পাথর চ'লে যেতো। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে তরুদিদির ত্রিসীমানা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতো, অন্ধ আক্রোশে তরুদিদির চোখ দুটো দপদপ ক'রে জ্বলছে। অমনি এক উত্তেজনার কালে একদিন আন্দু প'ড়ে গিয়েছিল তরুদিদির মুখোমুখি। তরুদিদি কেমন একপ্রকার তীব্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দূর-সম্পর্কের ছোট ভাইটিকে প্রশ্ন করলেন, তোর অসুখ করে না কেন? কি খাস তুই? কি জন্যে ভালো থাকিস?

সুস্থ থাকাটাই যেন অপরাধজনক। ভয় পেয়ে থতিয়ে মুখখানা লুকিয়ে আন্দু সেখান থেকে সরে গেল।

রোষে ক্ষোভে উত্তেজনায় তরুদিদি ফোঁস ফোঁস ক'রে ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে আবাল্য ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। একটি মেয়ের মৃগীরোগ,—কথায় কথায় সে বেঁকেচুরে যায়। পরের ছেলেটি জ্বর আর আমাশয়ে শয্যাগত। শান্তি ছিল না তাঁর। অথচ কী পরিমাণ অলঙ্কার সর্বাঙ্গে! তরুদিদির ওই ক্রুদ্ধ চলাফেরার মধ্যে তাঁর সর্বাঙ্গের গহনাগুলি ঝমর-ঝমর ক'রে বেজে ওঠে। গহনাগাঁটি খুলে রাখা জমীদারের স্ত্রীর পক্ষে নাকি সম্মানজনক নয়। তাঁরা পুবদেশের মস্ত জমিদার।

মাঝরাত্রে সহসা একদিন চীৎকার ক'রে উঠলেন তরুদিদি। রাত তখন বোধ হয় বারোটা। মা এলেন ছুটে, বুড়ো দাদুর ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য। তরুদিদির মাথা ধরেছিল সন্ধ্যাবেলা থেকে। হিমির ওপর হুকুম হয়েছিল, সে মাথার কাছে ব'সে তরুদিদির মাথা টিপে দেবে। ছেলেমানুষ মেয়ে, মাথা টিপতে টিপতে একসময় তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে। তরুদিদি তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মতো উঠে দাঁড়ান এবং সেই অন্ধকারে হিমির শরীরের কোথায় যেন কিভাবে আঘাত করেন, মেয়েটা নিজের পেটটা দুই হাতে চেপে ঘুমের ঘোরে এক-প্রকার আর্তনাদ করতে থাকে। চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এলো। তরুদিদি তারই ওপর হিমিকে এর মধ্যে দুঘা বসিয়ে দিয়েছেন। তরুদিদির মা মেয়েটাকে টানতে টানতে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আন্দু ঠাহর ক'রে দেখলো, হিমি মুখের আওয়াজ করছে বটে, কিন্তু চোখে তার এক ফোঁটাও জল নেই। আশ্চর্য, মেয়েটাকে কোনোমতেই কাঁদানো যায় না! কিন্তু তারও

চেয়ে আশ্চর্য সে-রাত্রে সবাই মিলে তরুদিদিরই সেবা করতে লাগলো।

একদিন হিমি আবার এক অপাট ক'রে বসলো। তরুদিদির নতুন পছন্দসই শাড়িখানা কাচতে গিয়ে বালতির খোঁচায় ছিঁড়ে ফালা দিয়ে শুকোতে দিল। ঘটনাটা তখন ঠিক টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু বিকেলে গা ধুয়ে এসে শাড়িখানা জড়াতে গিয়ে তরুদিদি একেবারে শিউরে উঠলেন। এ কাজ হিমি ছাড়া আর কা'রো নয়। তিনি বললেন, দাঁড়া, এবার তোর তেজ আমি ঘোচাবো!

বাড়ীসুদ্ধ থরহরিকম্প। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, হিমির কোনো গ্রাহ্যও নেই। একটি বালিকার জীবনে মারপিট যেন সয়ে গেছে,—ওটাকে অনিবার্য বলে জীবনের সঙ্গে সে মিলিয়ে নিয়েছে। কোনো লাঞ্ছনাতেই তার ভয় অথবা উদ্বেগ—কোনোটাই নেই।

একটি ছোট সুস্থ ও সবল মেয়ের 'তেজ ঘোচাবার' জন্য সকলের বড় অস্ত্র হোলো, তাকে সম্পূর্ণ উপবাসে রাখা। তরুদিদি সেই ব্যবস্থাই করলেন। তাঁর হুকুম এ বাড়ীতে অলঙ্ঘ্যনীয়। সেইদিনই সন্ধ্যা থেকে হিমির আহারাদি সম্পূর্ণ বন্ধ হোলো। শুধু তাই নয়, সেই শীতের সন্ধ্যায় নিজে এসে তরুদিদি হিমির কাঁথাকুঁথি নিয়ে চলে গেলেন। তিনি নামজাদা জমিদারের স্ত্রী, —অবাধ্য এবং দুঃশীল প্রজাকে কেমন করে সায়েস্তা করতে হয়, তাঁর জানা আছে বৈকি! তাঁর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হিমি

এলো, এবং এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে দেখলো তার বিছানার পুঁটলিটি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। দেখে-শুনে তারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে সটান গিয়ে দাঁড়ালো তরুদিদির সামনে। বললে, আমার বিছানা কই?

তরুদিদি চুপ। তিনি সেদিন কিছু অসুস্থ, তাঁর হার্টের অবস্থা সেদিন ভালো ছিল না। উত্তেজনা ঘটলে অসুখ বাড়তে পারে।

হিমি পুনরায় বললে, আমি বুঝি আজ থেকে খাবো না কিছু? সবাই খাবে, আর আমি খাবো না কি জন্যে?

তরুদিদির পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই।—

হিমি বললে, বেশ, আমিও বলে রাখলুম, খেতে না দিলে আমিও কোন কাজ করতে পারবো না।

হিমি চলে গেল। লেপ ঢাকা দিয়ে তরুদিদি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন।

দুদিন পরে ব্যাপারটা একটু রহস্যময়ই মনে হচ্ছিল। এক কাঁসি ভাতের কম যে-মেয়ের পেট ভরে না, তার সম্পূর্ণ উপবাস চলছে। হিমি খাচ্ছে না একবারও, সেদিকে তার চেষ্টাও নেই। সে ছটফট করবে, পায়ে ধরে কাঁদবে, এবং তার বদলে তাকে আরও উৎপীড়ন করা হবে—এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু হিমি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, তার ভ্রূক্ষেপও নেই কোনও দিকে। ডাকলে সে কাছে আসে না, এবং—বিস্ময়ের কথা,—খাদ্যের প্রতি তার

কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। বাড়ির সবাই ওই মেয়েটার দুর্ভাগ্যের দিকে আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত মেয়েটার চেহারা মনে করে কারো কারো মুখে অন্নও রোচে না। কিন্তু তরুদিদির সেদিকে এতটুকু গ্রাহ্য নেই। তাঁর জিদ বেড়ে গেছে। তিনি এবার ওই অবাধ্য মেয়েটার সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত চান। দেখা যাচ্ছে তাঁর হার্টের ব্যামোর কথা ভুলে গিয়ে তিনি কেমন যেন একপ্রকার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন, এবং রুগ্ন ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখে তিনি গোয়েন্দার মতো এদিক ওদিক ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে আসেন, কথায় কথায় সকলকে সাবধান করে দেন কঠিন কণ্ঠে,—খবরদার, কেউ ওকে খেতে দেবে না! আমি এর শোধ তুলবো।

দিন চারেক হতে চললো, হিমির মুখে অন্নজল নেই। অবাক করে দিল মেয়েটা সকলকে। সে পরম নিশ্চিন্তে একপাশে পড়ে থাকে, এবং আহারাদি সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। পরনের সেই নয়হাতি ধুতিখানার একপ্রান্ত মেঝের উপর বিছিয়ে রাত্রে সে অকাতরে ঘুমোয়। তরুদিদির মনে পরাজয়বোধ জেগে ওঠে। তিনি চান কেউ ওকে গোপনে খেতে দিক, এবং তিনি আহত সর্পের মতো তাকে ছোবল মারুন। কিন্তু এমন ভুল কেউ করে না। তরুদিদি তখন দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে রাত্রের দিকে এক একবার হিমিকে পাহারা দিয়ে আসেন। দেখা যায়, হিমি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। তার নিটোল কঠিন দেহের কোথাও অনশনের কৃশতা নেই।—বলিষ্ঠকায়া স্বাস্থ্যোন্নতা

কিশোরী মেয়েটার দিকে চেয়ে তরুদিদির দুই হিংস্র চক্ষু দপদপ করে যেন অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। অতঃপর আপন বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস চেপে তিনি ফিরে এসে লেপের মধ্যে ঢোকেন। নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে চীৎকার করে সারারাত সবাইকে গালি দিতে পারলে হয়তো তিনি কতকটা স্বস্তিবোধ করতেন।

সেই নিঃসাড় এবং নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ও-মহলের বিছানার ভিতর থেকে আন্দু এবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে তাকায়। না, কেউ কোথাও জেগে নেই। শেষবারের মতো টহল দিয়ে তরুদিদি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন, আর তিনি উঠবেন না।

আন্দু পা টিপে টিপে ওঠে। তারপর কুলুঙ্গী থেকে একটি কাগজের বাক্স নিয়ে চলে যায় দালান পেরিয়ে সেই ছোট ছাদের পাশে। সন্তর্পণে গিয়ে হেঁট হয়ে হিমির কানে কানে সে ডাকে। হিমি জেগেই থাকে আগের থেকে। আন্দু চাপা গলায় বলে, বাক্সের মধ্যে ভাত-চচ্চড়ি আছে। চৌবাচ্চা থেকে জল খেয়ে নিস।

তেমনি পা টিপে-টিপে আন্দু নিঃসাড়ে পালায়। মেয়েটা খাবার আগে ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসে।

পিত্রালয়ে তরুদিদির বসবাস এইভাবেই একদিন শেষ হয়ে আসতো। সকলের অশ্রদ্ধা কুড়োতেন তিনি, সকলকে পরোক্ষ-ভাবে অপমানও করতেন। যারা তাঁর পায়ের তলায় দলিত হোতো, তাদেরই কাছে তিনি পূজা প্রত্যাশা করতেন। তাঁর

ঘৃণার পাত্র ছিল সবাই। তিনি নিজে ছিলেন যেহেতু খর্বকায় ও স্থুলাঙ্গ, সেজন্য কারো মাথা উঁচু হোক—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আন্দুকে কাছাকাছি দেখলে তিনি চাপা উত্তেজনায় ফুলে উঠতেন।

তাঁর যাবার আগের দিন হিমি আবার একটা ভীষণ অপরাধ করে বসলো। বোধ হয় মাসিমাই কাপড় শুকোতে দেবার জন্য ছাদে উঠছিলেন। সিঁড়ির ঘরের পাশে চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন, খেজুর গুড়ের একটি নাগ্‌রির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হিমি গোপনে টাউ-টাউ করে গুড় খাচ্ছে। প্রায় আধখানা নাগ্‌রি সে তখন শেষ করে এনেছে।

খবরটা মাসিমা কোনোমতেই চাপতে পারলেন না। উঠে পালাতে গিয়ে হিমি সিঁড়ির উপরেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল কাপড়ে বেধে। খবর পেয়ে তরুদিদি ছুটে এলেন। তাঁর ঝি চুরি করে খাচ্ছিল, এ তো তাঁরই পক্ষে অপমান! দ্রুতপদে তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে একখানা বঁটি নিয়ে ছুটে এলেন। অমন মেয়েকে আজ তিনি কেটেই ফেলবেন। অনেকের ধারণা, সবাই মিলে তরুদিদির হাত থেকে বঁটিখানা সময় মতো সেদিন কেড়ে না নিলে তিনি মেয়েটাকে সত্যিই হয়ত কেটে ফেলতেন। তাঁরা বড় জমিদার,—বছরে দশ বিশটে দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলা তাঁদের নামে আলিপুর কোর্টে ঝুলেই থাকে। ওর ওপর না হয় আর একটা বাড়তো,—এই যা। কিন্তু বঁটিখানা হাত থেকে কেড়ে নিলেও তরুদিদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিয়ে কারও

উপায় ছিল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে একবার হাঁক দিলেন, সবাই সামনে থেকে সরে যাও বলছি। ও আমার ঝি, আমার ভাত-কাপড়ে মানুষ, ওর ব্যবস্থা আমার হাতে। তোমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।—বলতে বলতে তিনি একগাছা বাঁকারি নিয়ে দৌড়ে এলেন।

সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হিমির বেশ চোট লেগেছিল। হাঁটু কেটে গেছে, কোমরে আঘাত লেগেছে। সুতরাং ওই সিঁড়ি থেকে মেয়েটা আর উঠতে পারেনি। কিন্তু তারই ওপর যখন সপাসপ বাঁকারির ঘা পড়তে লাগলো,—অদূরে দাঁড়িয়ে আন্দুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো আর্ত কান্নার আওয়াজ। দাঁতের উপর দাঁত রেখে হিমি বসে আছে মাথা নিচু করে,—পিঠে আর মাথায় আর পায়ে পড়ছে বাঁকারির ঘা। রক্ত ফেটে পড়ছে তার চামড়া দিয়ে।

কিন্তু কেবল হিমিই মার খাচ্ছে না,—মার খাচ্ছে আন্দুও। সংসারে এক একটি প্রাণী এমন জন্মায়। মার খায় একজন মুখ বুজে, আঘাত খেয়ে কাঁদে অন্যজন। আন্দু ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—তরুদিদি রোষকষায়িত চক্ষে তার দিকে তাকান।

এতদিন পরে তরুদিদির মা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন,—ও ছাড়া তুই কি আর ঝি খুঁজে পাসনি তরু? এবার যখন আসবি, ওকে যেন আর এ বাড়িতে আনিসনে। মরণ হলেই মেয়েটার মুক্তি হয়।

তরুদিদির মা কেঁদে ফেললেন। হিমির মুখ দিয়ে আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল।

কিন্তু কান্নাকাটি সবই মিথ্যে হোলো। একটি দিনের মধ্যেই হিমি দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। গায়ে পিঠে তার দড়া দড়া দাগ, হাঁটুর কাছে কালশিরে, বাঁকারির ঘায়ে কপাল ফোলা,—কিন্তু সে সুস্থ। লোহা পুড়ে-পুড়ে ইস্পাতে পরিণত হয়েছে।

যাবার সময় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সকলের সঙ্গে হিমি গাড়িতে গিয়ে উঠলো হাসিমুখে। গাড়ি ছেড়ে দিল। অবাক হয়ে তার পথের দিকে আন্দু চেয়ে রইলো।

এরপর তরুদিদি বাপের বাড়িতে এসেছেন অনেকবার। বছরের পর বছর। কিন্তু হিমি আর একটিবারও আসেনি সঙ্গে। সে গ্রামের মেয়ে। গ্রাম থেকেই মায়ের সঙ্গে যেন কোথায় ভেসে গেছে। তার জন্য তরুদিদির কোনও উদ্বেগ নেই। হিমিকে ভুলে গেছে সবাই।

অনেক বছর চলে গেছে তারপর।—

সে-বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। মাসিমা মারা গেছেন অনেক কাল আগে। তরুদিদিদের আরও কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। ছড়িয়ে পড়েছে সবাই নানাদিকে।

আন্দু হয়েছে এখন আনন্দমোহন। বিয়ে করে সে ঘরসংসার পেতেছে অন্যত্র। সে এখন ইলেকট্রিক আপিসে চাকুরি করে। কোটপ্যাণ্ট পরে একখানা খাতা হাতে নিয়ে সে পাড়ায়-পাড়ায় লোকের বাড়ির মেন্-ইলেট্রিক মিটার পরীক্ষা ক'রে খাতায় টুকে নেয়। সাইকেল চড়ে তাকে আনাগোনা করতে হয়।

মাঝে মাঝে তাকে যেতে হয় অনেক অলিগলিতে।৮ হয়তো বা অনেক নোংরা পল্লীর আনাচে-কানাচেও কাজের জন্ম ঢুকতে হয়। ইতর-ভদ্র মানতে গেলে আফিসের কাজ চলে না। তবে কিনা কাজ হোলো তার মাত্র দুমিনিটের। মিটারের নম্বর মেলানো, আর কারেন্ট্ খরচের পরিমাণ পাঠ করে খাতায় টুকে নেওয়া—ব্যস, ছুটি।

হঠাৎ একদিন কিন্তু দুমিনিটে ছুটি পাওয়া গেল না। পিছনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েছেলে প্রশ্ন করলো, কত উঠলো এবার?

খাতায় টুকতে টুকতে আনন্দমোহন জবাব দিল, আশি ইউনিট্।

কথাটা শুনেও স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইলো। আনন্দমোহনের সময় কম, এখনও বহু বাড়ি বাকি। খাতা বন্ধ করে সাইকেল-খানার দিকে হাত বাড়াবার সময় স্ত্রীলোকটির দিকে তার চোখ পড়লো। সে একটু থতিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির মুখে মধুর হাসি, দুই কানে হীরের ফুল, গলায় জড়োয়া হার। যৌবনের লাবণ্য ঠিক্‌রে পড়ছে!

চেনো?

আনন্দমোহন ঢোক গিলে বললে, হিমি না?

না,—হেমাঙ্গিনী! চিনতে পেরেছ দেখছি! ষোল-আঠারো বছর হতে চললো, না?

হ্যাঁ, তা হবে বৈ কি। কতকালের কথা।—আনন্দমোহন ভদ্রকণ্ঠে জবাব দিয়ে একবার সাইকেলখানার দিকে তাকালো।

তোমার সেই তরুদিদির কি খবর? সেই জমিদারের গিন্নি?

আছেন তিনি এক রকম! দেশেই আছেন! তবে আমার ভগ্নিপতিটি মারা গেছেন বছর কয়েক হোলো।

হেমাঙ্গিনী একটু হাসলো। তারপর বললে, তোমার সেই বোন আমাকে উপোস করিয়ে রাখতো, আর তুমি ভাত চুরি করে অর্ধেক রাত্রে আমাকে খাওয়াতে,—মনে পড়ে?

কাষ্ঠ হাসি হেসে আনন্দ জবাব দেয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কত ছেলে-মানুষিই করা গেছে!—আচ্ছা, এগারোটা বেজে গেল, এবার যাই!

ও কি কথা—হেমাঙ্গিনী বললে, এতকাল পরে দেখা, সেই ভাতের দাম আজ শুধবো বৈকি!

আনন্দ মুখ তুলে তাকালো।—বিলক্ষণ! সেসব পুরনো কাসুন্দি। সেসব কি আর মনে করতে আছে? এবার আমি যাই। বেশ তো, অন্যসময়ে আবার দেখা হবে।

কঠিন হাসি হেসে হেমাঙ্গিনী বললে, না গো না, দেখা যখন পেয়েছি, সে-দেনা এখনই শোধ করবো। ভেতরে এসো। —বলতে বলতে হঠাৎ আনন্দর হাত থেকে খাতাখানা সে কেড়ে নিয়ে পুনরায় বললে, ঘরে না এলে এ খাতা এখনই ছিঁড়ে ফেলবো।

আনন্দ বললে, এমন করলে আমার চাকরি যাবে, তা জানো?

যাক্, আমি তোমায় এ পাড়ায় ভালো চাকরি দেবো। আমাকে দেখিয়ে অনেক রোজগার করতে পারবে।

আনন্দ বললে, একজনের ওপর রাগ আছে তোমার অনেক কাল আগে, তাই বলে আমাকে এসব অপমানের কথা বলছ কেন?

অপমান? হেমাঙ্গিনী হেসে বললে, ঠিক জানো এটা অপমান? যদি বলি এটা ভালোবাসা?

কিন্তু আনন্দকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ঝপ্ করে তার একখানা হাত ধরে হেমাঙ্গিনী তাকে উঠোন থেকে ঘরে তুলে আনলো।

অদূরে কয়েকটি মেয়েছেলে জোট পাকিয়ে বসে ছিল, এবার খিলখিলিয়ে ব'লে উঠলো, দেখো! দিনদুপুরে মাগির কাণ্ড দেখো!

ভিতরে এসে আনন্দ প্রতিবাদ জানালো,—আরে আরে, শোনো, বারোটার মধ্যে আমাকে আপিসে পৌঁছতে হবে। আঃ কি হচ্ছে এসব? সাইকেলখানা বাইরে পড়ে—চুরি যেতে পারে। ছাড়ো, ছাড়ো—

হেমাঙ্গিনী উল্লসিত কণ্ঠে বললে, সাইকেল গেলে আমিই তোমাকে আবার সাইকেল কিনে দেবো! কিন্তু তুমি হারালে আর যে তোমাকে পাবো না!

আনন্দ বললে, তোমার মতলব কি? তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। সরো, যেতে দাও আমাকে।

কোনও কথায় কান না দিয়ে হেমাঙ্গিনী ভিতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, যাবে বৈকি, তুমি কি আর থাকতে এসেছ? তবে ঘণ্টাখানেক বাদে যাবে।

আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না।

খিলখিল করে হেমাঙ্গিনী হেসে উঠলো,—লাগবে, একটু সবুর করো,—চোখ বুজে আসবে ভালো লেগে! দাঁড়াও, আগে পুতুলটিকে সযত্নে কোলে নিয়ে কলঙ্কের কালি মাখাই,—দেখবে তখন, দরজা খুলতে আর মন উঠবে না।

বাঘিনী আজ যেন তার শিকারকে ধরেছে। তার কঠিন কামড়ের থেকে পালাবার পথ ছিল না। সেই আবছায়াময় ঘরের গুমোটের মধ্যে হেমাঙ্গিনীর হিংস্র দুই চক্ষু দপদপ করে জ্বলছিল,—ঠিক যেমন জ্বলতো তরুদিদির দুই চক্ষু। দুই নারীর মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র এতকাল ধরে থেকে গেছে, সেই কথা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে আনন্দ যেন খেই হারিয়ে ফেলছিল।

বিশ্বসংসারের বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছে ততক্ষণে। শিকারটা প্রায় মৃত। ক্ষিপ্তোন্মত্ত জন্তুটা ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের রক্তটা লোল-জিহ্বাগ্রে লেহন করছিল। ঘরময় তখন ঘুরছে যেন একটা সুদূর মৃত্যুকণ্ঠের কান্নাজড়ানো প্রলাপ: মার খেয়ে লাথি খেয়ে যখন আমার পিঠ দুমড়ে যেতো, দিনের পর দিন কালশিরে পড়তো সর্বাঙ্গে···তখনও খেয়েছি নেড়িকুকুরের মতন, তোমাদের ভাত··· দ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সব অপমান তোমরা সবাই দেখতে···আজ আমার শরীরের থেকে ব্যাধি আর বিষ তুলে নিয়ে যাও। যদি পারো তোমাদের ওই জমিদারগুষ্ঠির মধ্যে এই বিষ ছড়িয়ে দিয়ো। বিষ নিয়ে যাও,—ছারখার হোক তোমাদের পরিবার!

আনন্দর ততক্ষণে মৃত্যু ঘটে গেছে!

প্রভঞ্জনী

মানিকপুর স্টেশন আজ কদিন থেকে জনতার জটলায় এবং কোলাহল কলরবে মুখর হয়ে রয়েছে।

মৌনী অমাবস্যার আর বিলম্ব নেই। মাঘমেলা বসবে প্রয়াগে। এবারে নাসিকে চলছে কুম্ভের আয়োজন, সেখানে ভারতবর্ষের ডাক পড়েছে। ইতিমধ্যে 'গুরুকুলের' ডাকে হরিদ্বারে সাধুসন্ন্যাসীদের একটা মস্ত মেলা বসে গেছে। লাখ দুলাখ পাঁচলাখের জনতা নড়াচড়া করছে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। মানিকপুর জংশন স্টেশন সেই নড়াচড়ার অন্যতম কেন্দ্র। সুতরাং বিপুল পরিমাণ ইতরসাধারণ ও সাধুসন্ন্যাসীর জনতায় স্টেশন এলাকার আশপাশ পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

জনার-ক্ষেতের ধারে এখানে ওখানে হোগলার তাঁবু পড়েছে অনেক। একটি তাঁবুর পাশে ধুনি জ্বলছে, তার সামনে বসেছে একদল সাধু ফকির। এরা তাড়া খেয়েছে অনেকবার রেলপুলিশের হাতে। দুদিন হতে চলল এরা গাড়ি ধরতে পারেনি। জনকয়েক মারধরও বুঝি খেয়েছে। এরা কিন্তু এসেছে নানা অঞ্চল থেকে। কেউ যাবে বীণা জংশন থেকে মধ্যভারতে, কোনো দল প্রয়াগের দিকে, কোনটা পঞ্চবটী,—নানা দল নানাদিকে ছড়িয়ে পড়বে। রেল কোম্পানি এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

টানা-হেঁচড়া, মারধর, ধাক্কাধাক্কি,—এর মধ্য দিয়েই দিনের পর দিন এক দেশ থেকে অন্য দেশের দিকে এরা এগোতে থাকে। আজ ভোরে একটা দল গা-ঢাকা দিয়ে গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু সুবিধে হয়নি। পুলিশের দল এসে পড়ে ওদের মাঝখানে, এবং চড়চাপড় ও ধাক্কা খেয়ে কয়েকজন পুনরায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এবম্বিধ অবস্থা চলছে প্রায় এক সপ্তাহ কাল। ওদের অপরিসীম ধৈর্য এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। ওরা আড্ডা নিয়েছে তাঁবুর সামনে।

চিমৃটি-বাবা মুখ খোলে না। ধুনিটা সামনে জ্বালানো। দুটি ছোট গাছের গুঁড়ি আগুনে দেওয়া আছে। সামনে রয়েছে একখানা টুকরো পাথর। ঝুলি একটি আছে পাশে। একটি কম্বলের আসন পাতা। লোটাটিতে জল ভরা আছে। আগুনে ছাই জমেছে প্রচুর। চিমৃটি-বাবা বোধ করি নাগা,—সর্বাঙ্গে ও মুখে ছাই মাখা। চুপ করে সে বসে রয়েছে।

এপাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে জন দুই। আজই সকালবেলায় একটি কাঁচা বয়সের ছোকরা সাধু এসে জুটেছে। সেও বোধ করি নাগা। তবে মাথায় জটা নেই, ছাঁটা একরাশ চুল। ছাইমাখা মুখখানা ভূতের মতন। পিটপিট করছে দুটো চোখ। কোমর থেকে পা পর্যন্ত আবরণ বড় কম। কিন্তু উপর দিকে দড়ি দিয়ে একখানা পাৎলা কম্বল পিঠের সঙ্গে বাঁধা। কম্বলের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ময়লা গেরুয়ার একটি টুকরো বাঁধা রয়েছে সামনের দিকে। কিন্তু গাত্রাবরণের অভাব নিয়ে

নাগাফকির মহলে কোনো কথা ওঠে না। সে এসে জায়গা নিয়েছিল একপাশে। এবার সে উঠে এসে চিম্‌টি-বাবার ছোট কল্‌কেটি সাজতে বসল, এবং শেষকালে ধুনির থেকে আগুন নিয়ে কল্‌কেটি সযত্নে সাজিয়ে চিম্‌টি-বাবার দিকে এগিয়ে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটাই নিঃশব্দে ঘটছিল। ছোকরা সাধুটি কে, কোথা থেকে সে আসছে, যাবেই বা কোথায়, এসব কেউ জানতে চায় না। কেবল তাই নয়, বিনা অনুমতিতে কল্‌কেটি কাছে নিয়ে সে তামাক সাজল,—সকলের মাঝখানে এসে বসল,—এতগুলো ঘটনার জন্য কোনো প্রশ্নও ওঠে না! বুঝতে পারা যাচ্ছে, দশ-বারো জন যারা একত্র হয়ে এই তাঁবুর ধারে বসে অনিশ্চিত যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে কেউ একজন অন্যজনকে চেনে না। ওদের অধিকাংশই ভস্মাচ্ছাদিত নাগা সাধু, এবং ভস্মের আবরণে একজন অন্যজনের নিকট রহস্যাবৃত।

একটি সাধু এবার বললে, সেওয়া যো হ্যায়, ও আপনা মর্জিসে নহী হোতা হ্যায়।

চিম্‌টি-বাবা এতক্ষণ পরে জবাব দিল। একটু ক্ষীণ কণ্ঠে সে বললে, পর্মেশ্বোয়ারকি কির্‌পা—!

কথাটা বলে সে চুপ করে গেল। ছোকরা সাধুটি বললে, বেশখ্‌—আসমানমে ভি নহী, জমিন্‌পরভি নহী! আপ্‌না আৎমামে ভাগোয়ান্‌!

চিম্‌টি-বাবা কল্‌কেটি দিল এবার তারই হাতে। খুশী হয়ে সে প্রসাদ নিয়ে কল্‌কেটিতে সুদীর্ঘ টান দিয়ে বলে উঠল, জয় শিউয়া শম্ভো।

তারপর অন্য হাতে গেল কল্‌কেটি। এবার একজন ওই ছোকরা সাধুর দিকে ফিরে বললে, কৌন ডেরা?

ডেরা নহী ন।

কাঁহাসে আতা?

বিজনৌরসে। আখাড়া হ্যায়।

একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকাল। চিম্‌টি-বাবা পুনরায় কল্‌কেটি নিয়ে আরেকটি টান দিয়ে তেমনি মিহি কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কৌন আখাড়া?

আখাড়া নওরঙ!—এ রাজুবাঈ, রোটি নহী পকাওগী?

যে স্ত্রীলোকটি বসেছিল এতক্ষণ একান্তে, সে ওই ছোকরা সাধুর ডাকে এবার সাড়া দিল। হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করল, কেমন করে 'পকাই'!

আ, পর্মাত্মা কী খুশীসে!—ছোকরা সাধুটি উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বললে, তাঁর যদি মর্জি হয়, ভাবনা কি? সেবা করবার মন চাই, রাজুবাঈ?

প্রবীণা রাজুবাঈ একটু নড়ে বসল মাত্র।

ছোকরা সাধুটি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জনতার মধ্যে অদৃশ্য হল।—কিন্তু সে ফিরে এল আধঘণ্টার মধ্যেই পুঁটুলি ভরে নিয়ে এবং তার সেই ভূতের মতো ছাইমাখা মুখের ভিতর থেকে হাসি

বার করে বললে, আভি আনন্দ্‌সে রোটি বানাও, রাজুবাঈ। লোটামে দাল ভি বানাও। লাল 'মিরচ্‌' আর 'নিমক' ভি লায়া হ্যায়।

ছোকরার বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে কিছু একটা হবে। অন্তত তাই আন্দাজ করা যাচ্ছে। চেহারাটা কৃষ্ণকায়, কিন্তু হাত-পা এবং শরীরের পিছনের অংশটায় আত্মনিগ্রহের ছাপ আজও তেমন পড়েনি। বরং তার ধূলিধূসরতা এবং ভস্মাবরণ সরালে কিছু লাবণ্যের পরিচয়ও মেলে। মুখখানা সম্পূর্ণ ভস্মাবৃত, এবং চুলগুলো ছাঁটা ও রুক্ষ। চুলের প্রাচুর্য তার যে আছে তা দেখলেই বুঝা যায়।

রাজুবাঈ মেয়েছেলে, কিন্তু এতগুলো নাঙ্গা সাধুদলের মাঝখানে ব'সে তার তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। একটু পরে একখানা ট্রেন নাকি আসবার কথা আছে, রাজুবাঈ সেই গাড়িখানা ধরে কোনও মতে পালাবার চেষ্টায় রয়েছে। তবু আহার্যের সন্ধান পেয়ে ওদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল বৈকি। কেউ আসন পেতে গুছিয়ে বসল, কেউ ঝুলি থেকে আরেক জটি গাঁজা বার করল, কেউ-বা জটার গোছা খুলে ওরই মধ্যে ফিরিয়ে বাঁধল।

একটি সাধু এতক্ষণ সাড়াও দেয়নি, কথাও বলেনি, এবং—বিস্ময়ের কথা,—কল্‌কেটাতেও টান দেয়নি।· মাথার লম্বা লম্বা চুল ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের ওপর, গালে ও কপালে বিভূতির কয়েকটা মোটা দাগ টানা, গায়ে একখানা গেরুয়া ছোপানো

ছেঁড়া চাদর, কিন্তু ভিতরে সে প্রায় নগ্ন। একখানা কম্বল একপাশে পেতে সে নিজের মনে উবু হয়ে বসে ছিল।

ছোকরা-সাধুটি এবার তাকে ডাক দিয়ে বললে, এ সোয়ামি, রোটি খাওগে ?

সাধু এবার মুখ ফেরাল। বললে, নহী।

কাঁহাসে আতা ?

বার্ধোয়ানসে।

মঠেদার হুঁ ?

সাধু ঘাড় নেড়ে বললে, জী, নারায়ণ মঠ !

কৌন জাত হ্যায় ?

বঙ্গালী !

ছোকরা-সাধু সহাস্যে তাকাল। বললে, কপ্ড়া নহী পহ্নতে ?

বাঙ্গালী সাধু জবাব দিল, পহন্তে হেঁ,—মগর মিলে তব না ? ম্যায় নাঙ্গা নহী হুঁ।

কয়েকজন সাধুসহ রাজুবাঈ এবং ছোকরা-সাধু—সকলেই এই 'বঙ্গালীর' সরস কথাটি শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামবার পর রাজুবাঈ বললে, এ নওরঙ্গী, ম্যায় রোটি নহী পকায়োঙ্গী।

ছোকরা-সাধু প্রশ্ন করল, কেঁও ? খাওগে নহী ?

রাজুবাঈ বললে, নহী।

ছোকরা-সাধুটি বড়ই ক্ষুব্ধ হল। বললে, ফিন্ শোচো, ভুখ্সে নহী মরোগী !

পর্মাৎমা কী মর্জি! উহ্ মেরে গাড়ি আ গৈ ভাই,—এই বলে রাজুবাঈ তার পুঁটুলি-কম্বল নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু কি মনে করে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকল, এ নওরঙ্গী—

ছোকরা-সাধুটি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজুবাঈ কি যেন চুপি-চুপি বললে। কিন্তু কথাটি শুনে ফস করে চটে উঠল নওরঙ্গী! ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আ, চুপ রহো তুম্! যা কিছু হয় তাঁর হুকুমে হয়। তুমি আমি কে? অপ্‌নে দিল্‌কো সাফা রাখ্‌না চাহিয়ে। চল্—

রাজুবাঈ মুখ ফিরিয়ে হনহন করে চলে গেল। প্রেতসুলভ সেই চেহারাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে তাচ্ছল্যের সঙ্গে নওরঙ্গী বললে, ঘরগিরস্থি কী বাৎ দুসরী হ্যায়।—এই বলে নিজের কাজে সে মন দিল।

চিম্‌টি-বাবা এতক্ষণ পরে একবার মিটমিট করে তাকাল সেই বঙ্গালী সোয়ামির দিকে। তারপর এক চিমটি ছাই ধুনি থেকে তুলে হাতখানা বাড়াতেই বাঙ্গালীটি এগিয়ে গিয়ে নিজের কপালে টিপ নিল। নওরঙ্গী ওধার থেকে সহাস্যে বলে উঠল, ইয়া, ভাগোয়ানকা আশিস মিল গিয়া! জয় শিউয়া শম্ভো!

ট্রেন চলে গেল একখানা। বিপুল জনতার একটা অংশ ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। কেউ গেলে কেউ ফিরেও তাকায় না। পিছনে যে পড়ে রইল, কেউ তার খোঁজও করে না।

ছোট্ট তাঁবু, দুদিক তার খোলা। পিছনের দিকটা জনারের ক্ষেত,—ওর ভিতর দিয়ে গেলে কিছুদূরে আছে একটি 'তালাও'।

সেখান থেকে এরই মধ্যে নওরঙ্গী দুই লোটা জল এনেছে। এর আগে সের দেড়েক আটা সে ভিক্ষে পেয়েছিল এবং উপরি হিসেবে আনা তিনেক পয়সাও এই সঙ্গে জুটে গেছে। ভিক্ষের হাত তার ভালই। ওটা সে জানে।

ঝুলির থেকে বেরল টিনের থালা, কাঠের কৌটো এবং একটি রুদ্রাক্ষের মালা। ছোকরা ওরই মধ্যে একসময় এসে লোটায় ডাল দিয়ে ধুনির আগুনে বসিয়ে দিল। তার এই অধ্যবসায় ও আগ্রহ তারিফ করার মতো। চিম্‌টি-বাবা একটিও কথা বলছে না, অন্যান্য সাধুরা পড়ে রইল বোধ করি চাপাটির আশায়। ওপাশে তেমনি উদাসীন হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে সেই বঙ্গালী,—বর্ধমানের নারায়ণ মঠের সেই সর্বহারা সাধুটি।

নওরঙ্গী গিয়ে টিনের থালায় আটা ছানতে ব'সে গেল। তারপর প্রসন্নমুখে একসময় সে বললে, আমি কিছু করছিনে, সব কাজ করাচ্ছেন 'ভাগোয়ান'। ইন্‌সানকা হাত, পর্মাত্মা কি বাত! আদমিকো সেওয়া, পর্মাত্মা কি পূজা!

কেউ শুনছে তার কথা, কিংবা কেউ শুনছে না—এটি বুঝবার যো নেই। নওরঙ্গী আবার বললে, শরীর হামার নয়, ভুখ ভি নহী। যা কিছু মানুষ খায়, সবই তাঁর 'পরসাদ'। এক এক 'আদমি', ভাগোয়ানকো এক এক লীলা! দুনিয়ায় যা কিছু দেখি, সব তাঁরই তামাসা! পহিলে আপনেকো পহ্‌ছানো, তব্‌ দুনিয়াকো দেখো, বাবা।

কেউ তার কথা কানে তুলছে কিনা বলা কঠিন। তবু

হাসিমুখে আটা ছানতে ছানতে নওরঙ্গী তার অধ্যাত্মদর্শন আওড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে এক সময় ছোকরা উঠে এসে একজন সাধুকে বললে, এ মহারাজ, দালমে নিমক ছোড় দো।

পুঁটিলিটি এগিয়ে ধরতেই সেই সাধুটি এক খাবল মুন তুলে নিয়ে ডালের লোটার মধ্যে ফেলে দিল। ডাল তখন ফুটছিল। ওর মধ্যে লাল লঙ্কা আগেই পড়েছিল।

বেলা মধ্যাহ্ন। প্রান্তরের এদিক ওদিকে দেখা যাচ্ছে, নিকটে ও দূরে জনতার ভীড় আরও যেন বেড়ে উঠেছে। বোধহয় আরেকখানা ট্রেন আসবার সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছিল, সুতরাং এদের ভিতর থেকে ফস করে জন তিনেক সাধু ঝুলি ঝোলা আর আসন তুলে নিয়ে সেদিকে দৌড় দিল। নওরঙ্গী শুধু ওদের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, কম্‌বক্‌ত্‌!

রুটির টান নয়, তাঁবুর আকর্ষণ নয়,—ওরা হঠাৎ সমস্ত আত্মীয়তা ভুলে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বাঙ্গালী সাধুটি সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

নওরঙ্গী হঠাৎ বলে বসল, কম্‌বকৃত রোটী ছোড়কে ভাগ গয়া, চিম্‌টি বাজায়কে ফিরনা হ্যায়। ক্ষিধের জ্বালায় মরবে, তবু পিছনে ফিরবে না। ওদের কপালে নেই, বুঝেছ? পানিকা তালাও সামনে ছোড়কে ভাগতা হ্যায়, অব দেখো তিয়াসসে উস্‌কা ছাতি ফাট যায়েগা! কৌন জানে নারায়ণকী লীলা, ভাই? বাঙ্গালী সাধু নওরঙ্গীর দিকে তাকিয়ে শুধু বললে, মর্‌নে দেও!

আটার তাল নিয়ে নওরঙ্গী বাইরে এল। এখন ওরা মোট চারজন, বাকি সবাই চলে গেছে। বাঙ্গালী সাধু খাবে না। ওকে বাদ দিলে তিনজন দাঁড়ায় মাত্র। কিন্তু নওরঙ্গীর হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় ছিল না। সে এসে পাকড়াও করল বাঙ্গালী সোয়ামিকে। ডালের লোটাটা নামিয়ে রোটী পাকিয়ে দিতে হবে। গলা বাড়িয়ে সে বললে, সাধুসেওয়া করো, ওভি নারায়েণকা সেওয়া হ্যায়, সোয়ামি! যা কিছু তুমি করবে, সব কাজ তাঁর। তিনি করছেন তোমার হাতে, তিনি দেখছেন তোমার চোখে, তিনি খাচ্ছেন তোমার ক্ষুধায়।

এত সহজে সে বলছে এবং এমন অনায়াস তার মন্তব্যগুলি যে, চট করে তার কোন উপরোধ অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সোয়ামি এবার এগিয়ে গিয়ে ধুনির কাছে বসল এবং ছোট্ট তাওয়াইটি ধুনির উপরে সুকৌশলে বসিয়ে রুটি সেঁকতে আরম্ভ করে দিল। এর আগেই কে যেন ডালের লোটাটা নামিয়ে নিয়েছে।

ওরই এক ফাঁকে নওরঙ্গী আবার গেল বেরিয়ে জনকোলাহলের দিকে। মতলবটা তার ঠাহর করা যায় না বটে। ঘণ্টাখানেক বাদে সে যখন ফিরে এল, দেখল তিনটে লোকের খাওয়া শেষ হয়েছে। চিম্‌টি-বাবা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বসে রয়েছে চোখ বুজে। কয়েকখানা মোটা রুটি কম্বলের ওপর রেখে বাঙ্গালী সাধু পাহারা দিচ্ছে। নওরঙ্গী এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল, তারপর তার ঝুলি থেকে গোটা চার পাঁচ মাঝারি

গোছের পেয়ারা বার করে বললে, রুটি যদি না খাও তবে আমরুৎ নাও। আৎমাকো ভুখে রাখো নহী, সোয়ামি!

চিম্‌টি-বাবা চোখ বুজেই একসময় বললে, জয় শিউয়া শম্ভো! বোম্ শঙ্কর!

নওরঙ্গীর আগ্রহের আতিশয্যটি শোভন ও সুশ্রী। এক কথায় এটাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না। পেয়ারা ছুটো হাতে নিয়ে সোয়ামি শুধু বললে, নারায়েণ নারায়েণ!

দানের মধ্যেও ঘটা কিছু নেই। ভিক্ষে করে আনাটাও যেমন সহজ, দেওয়াটাও তেমনি অনায়াস। নওরঙ্গী সেবা করতে বেরিয়েছে, ওটাতেই যেন তার সাধনার অভিব্যক্তি। সোয়ামি এবার তার ঝুলি থেকে গোটা ছুই চার শুকনো খেজুর বার করে নওরঙ্গীর দিকে চেয়ে বললে, লেওগে?

জরুর!—খুশী হয়ে নওরঙ্গী হাত বাড়িয়ে খেজুর নিল। বললে, বোম্ শঙ্কর···হর হর হর! তুমারা হাতসে দেওতাকা আশিস। তুমি কেউ না, তিনি দিচ্ছেন। তোমার মধ্যে তিনি।

সোয়ামি এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ছুদিন তার কাটল এখানে। কোথা থেকে সে আসছে এ কথা ওঠে না। কোন্ দিকে সে যাবে তার জন্যও কারো কৌতূহল নেই। তবে বার ছুই সে চেষ্টা করেছিল কাশীর গাড়ি ধরবার জন্য, কিন্তু পারেনি। একখানা প্যাসেঞ্জার বোধ হয় এখুনি এসে হরপালপুরের ওদিকে যাবে,—সোয়ামির চোখ ছিল সেদিকে।

ছোট্ট একটি লাঠি তার সঙ্গে। ঘটিটা বাঁধাই থাকে ঝুলির

দড়িতে। একখানা মোটা ছোট কালো কম্বল, অতটা ভারি নয়। পিঠের সঙ্গে বাঁধা আছে নরম কম্বলটি। ঝুলিটি ছোট। হঠাৎ যদি কখনও সেটি হারায়,—এমন কোন ক্ষতি হবে না। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সেই আদিম কালের একটি দানা আজও আছে। সেটি হল সংগ্রহবৃত্তি। সোয়ামিও তার হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু ওই ছোকরা নওরঙ্গীর বেলাতেও যা দেখা যাচ্ছে, তার বেলাতেও তাই। জঞ্জাল জমে ঝুলির মধ্যে একে একে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সমস্তগুলোর অর্থ যায় ফুরিয়ে। সেই জঞ্জাল নিজের হাতেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে পড়ে। এ বেলায় যে সামান্য সামগ্রীটি নিয়ে সন্ন্যাসী পরম যত্নে তার ঝুলির মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছে, ওবেলায় গিয়ে পৌঁছে সেই সামগ্রী তার অর্থ হারায়।

নওরঙ্গী আর-এক কল্‌কে তামাক সাজতে বসে গিয়েছিল। সামনে পড়ে ছিল কয়েকখানা মোটা রুটি আর ঘটিতে খানিকটা ডাল। একবার সেদিকে তাকিয়ে সোয়ামি বললে, জয় শম্ভো! চল্‌তা হ্যায় ভাই—

নওরঙ্গী মুখ তুলে একবার তাকাল। সোয়ামি লাঠিটি তুলে নিয়ে অগ্রসর হয়ে গেল। চিম্‌টি-বাবাকে কেন্দ্র করে আবার বসল গঞ্জিকার আসর। কারো সঙ্গে কারো হৃদয়ের কোনো যোগ নেই।

প্যাসেঞ্জার গাড়িখানা ধীরে ধীরে স্টেশনে এসে পৌঁছল। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ থামবার আগে তৃতীয় শ্রেণীর জনতা ছুটে গিয়ে

তাকে আক্রমণ করল। শীতকাল তাই রক্ষা, নচেৎ এই অপরাহ্ন-কালের রৌদ্রের তাপে ভীড়ের ভিতরে মানুষের দম বন্ধ হয়ে যেত। কেউ মার খেলে, কারো হাত-পা মচকালো, কারো পুঁটলি পোঁটলা হারালো, কেউ বা স্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চেঁচামেচি শুরু করল। যত লোক উঠতে পারল, তার চেয়ে দশগুণ বেশি মেয়েপুরুষ ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে পড়ল। এক সময় প্যাসেঞ্জারটি স্টেশন ছেড়ে ধীরে ধীরে আবার বেরিয়ে গেল।

এদিকে গঞ্জিকার আসর গিয়েছে ভেঙে। দুজন নতুন সাধু এসে ইতিমধ্যে হাজির হয়েছিল। কে তারা, কোন পরিচয় নেই। কোন্ পথে যাবে, জানাও যায়নি। কিন্তু রুটি আর ডাল ছিল। ক্ষুধার্ত সাধু কপাল জোরে পেয়ে গেল খাদ্য। দুজনের মধ্যে একজন একখানা রুটি আবার পুঁজি করে রাখল তার কম্বলের পাটের মধ্যে। ওদের মধ্যে একজন বললে, খাতা হ্যায় কৌন্, খিলাতা হ্যায় ভি কৌন্?

সাচ্চি বাৎ।—জবাব দিল নওরঙ্গী।

চিম্‌টি-বাবা শুধু অর্ধনিমীলিত চোখে বললে, বোম্ মহাদেও।

সাধু দুজন চলে যাচ্ছিল, নওরঙ্গী তার তল্পি থেকে শেষ দুটি পেয়ারা দুজনকে দিয়ে বললে, জয় শিউয়া শম্ভো!

এমন সময় আবার ফিরে এসে দাঁড়াল 'বঙ্গালী সোয়ামি'।

ক্যা সোয়ামি, চড়নে নহী শকা?—হেসে উঠল নওরঙ্গী।

নহী।

এখন তবে কি করবে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে সোয়ামি শুধু বললে, পড়ে থাকব এখানে কোথাও। কাল ভোরে আবার গাড়ি।

নওরঙ্গী ওকে সতর্ক করে দিল,—এখন শীতকাল মনে রেখো। ময়দান পর নহী শোনা। বহুৎ 'সর্দি' গিরতা হ্যায়। অব সিপাহি লোক হামলা নেই করেগা, তব তাম্বুকে অন্দরমে রহ্ যাও।

সোয়ামি সেইখানেই ধুনির পাশে বসল। কিন্তু তাঁবুর ভিতরটায় নজর করে দেখল, নওরঙ্গীর তল্পিটি সেখানে রয়েছে বটে,—তবে গত কয়েকদিন যাবৎ অগণিত জনসাধারণের উৎপাতে ভিতরটা জঞ্জালে ভরে রয়েছে। এঁটোকাঁটা ভাঙ্গা হাঁড়ি আর পাতায় ভিতরটা পরিপূর্ণ।

শীতের বেলা ছোট। দেখতে দেখতে রোদটুকু রাঙা হয়ে গাছেপালায় গিয়ে উঠল। রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়বে, এখনি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চিমৃটি-বাবা বসেছে ধুনিটির ঠিক সামনে, তার কোনও অসুবিধা নেই। আর যে-সাধুটি কম্বল ঢাকা দিয়ে পড়ে রয়েছে, সেও নাকি ভোরের দিকে সরে পড়বে।

ভেবে-চিন্তে দেখা গেল, নওরঙ্গীর প্রস্তাবটি মন্দ নয়। সুতরাং পিঠ থেকে দড়িদড়া খুলে লোটা আর লাঠিটি নামিয়ে সোয়ামি গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। সাধুসন্ন্যাসীদের ঘৃণা বলতে বিশেষ কিছু নেই। সোয়ামি একটু এগিয়ে গিয়ে ভিতরটা যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করতে লেগে গেল। জায়গাটুকু অতিশয় সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনমতে একপাশে কাৎ হয়ে রাতটুকু না কাটিয়ে গেলেও উপায় দেখা যাচ্ছে না।

নওরঙ্গী বোধহয় কোন একটা স্তোত্র আওড়াচ্ছিল। সোয়ামিকে কর্মতৎপর দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে ছোকরা বললে, শরম নহী মানো, সাধু ভাই। যিৎনা জীউ, ওৎনাহি শিউ। তোমার কাজ আমার কাজ,—একই কাজ, একই 'সেওয়া'।

সোয়ামি ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, কিস্‌কা সেওয়া?

ভাগোয়ানকা! তুম শুৎ রহোগে, ওভি পর্মাৎমাকা কাম। আদমিকা শরীর সে যো ময়েল্ নিকালতি হৈ, ওভি পর্মাৎমাকা কানুনসে হোতা হ্যায়।

বলতে বলতে নওরঙ্গী এগিয়ে এল। সেও লেগে গেল কাজে। নোংরা জঞ্জাল সরাতে সরাতে সে বললে, 'পর্মাৎমা' পা দিয়েছে চলবার, হাত দিয়েছে কাজ করবার, চোখ দিয়েছে দেখো তাকে, মন দিয়েছে উপলব্ধির, প্রাণ দিয়েছে বাঁচবার। তুমি ভেবে ছাখো সোয়ামি, তোমার দেহটা তাঁরই সকল কাজ করছে! 'বুরা কাম যো হ্যায়, ওভি উন্‌কা মর্জিসে হোতা হ্যায়'।

দেখতে দেখতে নওরঙ্গী ক্ষিপ্র হস্তে সমস্ত জঞ্জাল নিয়ে তাঁবুর বাইরে সরিয়ে দিয়ে এল। কেবল তাই নয়, ওরই এক ফাঁকে বাইরে গিয়ে জনারের ক্ষেতে ঢুকে কয়েকটা লম্বা লম্বা পাতা সমেত ডাল ভেঙ্গে এনে তাঁবুর ভিতরে বিছিয়ে দিল। বাঙ্গালী সোয়ামি এবার বাইরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এক লোটা জল নিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল। এসে দেখল নওরঙ্গী ভিতরের সব কাজ সেরে দিয়ে চিম্‌টি-বাবার কাছে গিয়ে বসে আবার প্রাণভরে

টান দিচ্ছে গাঁজার কল্‌কেটিতে। সারাদিনে গাঁজা সে টানল প্রচুর। তার সমস্ত মুখ গলা কণ্ঠা হাত—এমন কি মাথার ঝাঁপা চুলের রাশি অবধি আগাগোড়া ছাইমাখা; কিন্তু তারই ভিতর থেকে মাদকাবিষ্ট রাঙা দুটো চোখ সব সময় আগুনের ডেলার মতো জ্বলছে। তার পরনে মাত্র কৌপীন, কিন্তু কোমরে একখানা ময়লা থানের টুকরো গামছার মতো বাঁধা। গায়ে একখানা টুকরো কাপড়ের পাট, কিন্তু তার ওপর বোধ করি ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য দড়িদড়া দিয়ে একখানা কম্বলও জড়ানো।

তাঁবুর ভিতরে এবার ধীরে-সুস্থে বসে সোয়ামি তার তল্পিটি খুলল। ভিতর থেকে বেরোল চটাওঠা কলাইয়ের বাটি এবং এক ডেলা ভেলিগুড়। আরকটি ছোট্ট পুঁটলি ছিল, তার মধ্যে দেখা গেল আন্দাজ এক পোয়া ময়লা রঙের চিঁড়ে। রুটি আর ডাল বোধকরি তার ধাতে সয় না। তার বাঙালী রসনা ওতে আজও অভ্যস্ত হয়নি।

আয়োজন করে সে বেশ গুছিয়ে বসেছে, এমন সময় বাইরে আবার একটা রোল উঠল। একখানা গাড়ি আসছে। হঠাৎ গাঁজার কলকেটা চিম্‌টি-বাবার হাতে ছেড়ে দিয়ে নওরঙ্গী উঠে এলো, এবং বিদায়-সম্ভাষণের কিছুমাত্র অবকাশ না রেখে তার তল্পি আর চিমটেটি তুলে নিয়ে 'বোম-শঙ্কর' বলতে বলতে দৌড় দিল স্টেশনের দিকে। সারাদিন ধরে বোধ করি এই গাড়িখানার জন্যই সে ওৎ পেতে ছিল। চিম্‌টি-বাবা শুধু তার পথের দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত সকাল-বিকাল ধরে ছেলেটা সকলের

পরিচর্যা করে চলে গেল। তার দাক্ষিণ্য যেমন অকৃপণ, সেবা ও পরিচর্যার অধ্যবসায়টিও তেমনি অহেতুক।

প্রান্তরের উপরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরের কোন বস্তির প্রান্ত থেকে ক্ষুধার্ত কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। ধুনির আগুন জ্বলছে কোথাও কোথাও অন্ধকারে প্রেতচক্ষুর মতো। কোথায় যেন ইঞ্জিন থেকে স্টিম-এর আওয়াজ আসছে অনেকক্ষণ থেকে। কোনো কোনো তাঁবুর আশেপাশে সুর করে কোন কোন যাত্রীদল গান ধরেছে। থমথম করছে রাত্রি।

চিমটি-বাবা এবার উঠেছে—দিনমানের আলোয় যাকে উঠতে দেখা যায় না। ছাইমাখা নগ্ন সর্বত্যাগী নাঙ্গা সাধু নিরুদাসীন চক্ষু নিয়ে সমস্ত দিন ধরে ধুনির সামনে বসে থাকে। কিন্তু রাত্রির ছায়ায় তাকে 'মানুষ' হয়ে উঠতে হয়—কারো যখন লক্ষ্য থাকে না। মানবদেহের আইনকানুন তখন পালন না করলে চলে না। স্নান করতে হয়, রুটি বানাতে হয়, জল আনতে হয়—নতুন করে ছাই মাখতে হয়। শুধু তাই নয়, খাবার সময় কুকুর এসে দাঁড়ালে তাকে তাড়াও দিতে হয়। চিমটি-বাবা যখন এই সব কাজকর্মাদি সেরে তার ঝুলি থেকে আটা বার করে রুটি বানাতে বসেছে, সেই সময় ছায়ান্ধকারের ভিতর দিয়ে যে-মনুষ্যটি এসে দাঁড়াল সে নওরঙ্গী।

বাবা কা সেওয়া হোতা হ্যায় ক্যা?

চিম্‌টি-বাবা সাড়া দিয়ে বললে, হাঁ মহারাজ! বৈঠো—

পানি লা হুঁ ?—নওরঙ্গী প্রশ্ন করল।

পানি লায়া ভাই! দাল রোটী বনা লেতা। ভুখ লগা বহৎ। তুম্ আপস আ গয়া কাহে ?

নওরঙ্গী জবাব দিল, ভাগোয়ানকো মর্জি! উও ডাকগাড়ি থী। এক শালা হারামী সিপাহি আয়কে মারা হামকো।

মার দিয়া ?

জী। এক ঝাঁপড় লাগায়া মুখপর। দাঁতসে খুন নিকাল গয়া।

চিম্‌টি-বাবা সমবেদনাসূচক কণ্ঠে বললে, আ-হা! এক পাত্থল উঠায়কে শালাকো কেঁও নহী খতম্ কিয়া ?

নওরঙ্গী শুধু বললে, পর্মাৎমাকি উপর ছোড় দিয়া, মহারাজ!

রোটী খাওগে ?

নহী। ম্যয় ত খা লিয়া ভিখ মাংকে।—ব্যস, এক ছিলম্ তাম্‌বাকু পিকে লে যাউঙ্গী। বড়া সর্দি গিরা।—এই বলে নওরঙ্গী গায়ের উপর কম্বলখানা জড়িয়ে সেইখানে বসে গাঁজার একটি ছোট কল্‌কে ও মসলা বার করল।

রুটি সেঁকতে সেঁকতে চিম্‌টি-বাবা বললে, পয়রাগসে কাশী—উসকে বাদ হরদোয়ারমে যায়কে আসন লে লুঙ্গী। তুমকো কাঁহা যানা হ্যায় ভাই ?

নওরঙ্গী কল্‌কেটি টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললে, খাণ্ডোয়া যাতা হুঁ। হুঁয়াসে নাসিক চলেঙ্গা, মহারাজ। রাস্তা দুসর হৈ। শিউয়া শম্ভো!

কল্‌কেটি নিয়ে তল্পির মধ্যে রেখে নওরঙ্গী এবার উঠে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ভিতরে ঠাণ্ডাটা প্রবল। অল্প একটুখানি জায়গার মধ্যে সেই বাঙ্গালী সোয়ামিটি কোনমতে মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল। নওরঙ্গীর সাড়া পেয়ে সে এপাশ ফিরে অন্ধকারের মধ্যেই প্রশ্ন করল, আপস আ গয়া ক্যা ?

জী—নওরঙ্গী জবাব দিল--কাল সুবা চলা যাউঙ্গা। গাড়ি নহী মিলি তব পয়দল-পয়দল যাউ। রেলবাইকা আদমি বড়া হারামী হ্যায়।

সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে রাত্রির মতো ব্যবস্থা করতে গিয়ে বার বার সোয়ামির গায়ে ঝাপটা লাগছিল। কম্বলটি বিছিয়ে সেখানেই বসল নওরঙ্গী। দাঁতের ব্যথাটা একটু কমেছে, কিন্তু মুখখানা আঘাতে কতকটা আড়ষ্ট। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়েছিল, কাপড়ে তার ছোপ রয়েছে। নওরঙ্গী সেইখানে বসেই তার পিঠের দিককার দড়িদড়াটা খুলে একটু সহজ হবার চেষ্টা করল। প্রায় পনের ছিলিম গাঁজা সারাদিনে সে টেনেছে। ভিতরটা সজাগ আছে, কিন্তু চোখ দুটো ঢুলছে। নিদ্রা নেই ত্রিসীমানায়, কিন্তু তন্দ্রা রয়েছে দুই চোখে। শীত করে শুধু শরীরের বাইরের চামড়াটায়, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগে না। ভিতরটা গরম। ক্ষুধা সামান্যই, কারণ নিবিড় একটা আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকা যায়। দেহটা যায় খসে মন থেকে,—মনের সঙ্গে মহাশূন্যের একটা যোগাযোগ ঘটে। সেই অন্তহীন শূন্যতার নাম বোধ হয় ব্যোম!

সোয়ামি, নিদ্ আগয়া ক্যা ?

সোয়ামি হিন্দুস্থানীতে জবাব দিল, সন্ন্যাসীকে ঘুমোতে নেই।

নওরঙ্গী বোধ হয় একটু আরাম করেই বসেছিল। তাঁবুর দরজার ওপাশে চিম্‌টি-বাবা 'রোটী' পাকানো নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে তার তালির শব্দ আসছে। নওরঙ্গী তার তল্পি থেকে কয়েকটা বাদাম বার করে বললে, কত দিন থেকে তুমি সন্ন্যাস নিয়েছ ?

একটুখানি চুপ করে রইল সোয়ামি। পরে বললে, সন্ন্যাস আমি নিইনি। ঝুট নহী কহেঙ্গে।

নওরঙ্গী তার হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করল, তবে যে সকালে বললে তুমি নারায়ণ মঠের সাধু ?

সোয়ামি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। অতঃপর নিজের ঝুলি থেকে একটি বিড়ি বার করে ওপাশ ফিরে দেশালাই দিয়ে ধরাল। নিজের মনেই বিড়ি টানতে লাগল।

নওরঙ্গী বললে, কথা বলছ না যে ? ঠকিয়েছে বুঝি কেউ ? কোই কিসিসে দিল্ টুট্ গয়া ? মার খেয়েছ কোথাও ?

সোয়ামি কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না। শুধু বললে, তোমাকে বলে লাভ কি, সাধু ভাই ?

কুচ্ নহী।—নওরঙ্গী হাসিমুখে বললে, তবে কিনা এটা মনে রেখো, দুঃখের কথা যত বলবে ততই হালকা হবে। আদমিকা আঁশু, ভাগোয়ানকি হাস্থ ! শোচনেমে মজা লাগতা হৈ।—লেও, বাদাম খাও।

অন্ধকারে একধারে পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে সোয়ামি বাদামগুলি হাত বাড়িয়ে নিল। নওরঙ্গী এবার বললে, তোমার ঘর-গিরস্থি আছে ?

সোয়ামি জবাব দিল, এখন নেই, আগে ছিল।

জয় শিউয়া শম্ভো ! নারায়ণ !—নওরঙ্গী বললে, এমনিই হয় সোয়ামি—দুনিয়াতে নিজের কেউ নেই ! যা কিছু সামনে দেখবে, সব পর্মাৎমাকি খেল্। তোমার চারিদিকে খেল্না দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।—দুখ্ নহি সম্ঝো ! দর্দ মালুম হোগা—তাহলে তুমি ভগবানের পায়ে অপ্‌নেকো ডাল দেও ! উসিমে আনন্দ্ ভাই !

সোয়ামি জবাব দিল না।

এই আমার কথাই ধর না কেন !—নওরঙ্গী আরম্ভ করল, 'এক ধরম হাম মান লিয়া'। আমি সেবা করব ! জীবনে পাব না কিছু জানি, তাই কিছু চাইনি কোথাও। ভিক্ষে না পেলে খাব না, সঞ্চয় করব না, আঘাত দেব না, দুঃখকে মানব না। 'জনম সে জনম ঢোঁড়তে রহুঁগা পর্মাৎমাকো'। ওতেই আমার আনন্দ ! সেবায় আনন্দ, পরের জন্যে জীবন দিয়ে আনন্দ ! যা কিছু করি আনন্দে করি, আনন্দে আমার বাস, আনন্দেই আমার শ্বাস। মায়া হ্যায় দুনিয়া ! পর্মাৎমাকি আনন্দ্‌সে মায়া পয়দা হুয়া ! ওঁ নারায়ণ।

সোয়ামি এবারেও কোন কথা বললে না। বুঝতে পারা যাচ্ছে এতক্ষণ পরে নওরঙ্গীর নেশাটা নিবিড় হয়ে উঠেছে।

বাইরে থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে চিমটি-বাবা ডাল-রুটি চিবোচ্ছে। ঠাণ্ডায় ময়দানের উপর দিয়ে তুহিনের মতো হাওয়া দিচ্ছে। প্রান্তরের জনতার সাড়াশব্দ এবার অনেকটা কমে এসেছে। একটু আগে যে-ডাকগাড়িখানা চলে গেছে, দূর অন্ধকারে তার শব্দ এখনও মিলোয়নি।

বাদাম খা লিয়া, সোয়ামি? আউর লেওগে?

দেও!—সোয়ামি এতক্ষণ পরে কথা বললে, অব তো থোড়া তিয়াস লাগা। পানি হ্যায় নজদিগমে?

আ ভাগোয়ান। তেষ্টা পেয়েছে বলনি এতক্ষণ?—নওরঙ্গী একটু ব্যস্ত হয়েই অন্ধকারে হাত বাড়াল এবং তার জলসুদ্ধ লোটাটি নিয়ে সোয়ামির হাতে দিয়ে বললে, পিয়ো মজেমে!

লোটায় চুমুক দেবার আগে সোয়ামি শুধু বললে, তোমার সঙ্গে তেমন কথা বলতে পাচ্ছিনে শুধু মাথাটায় সারাদিন 'দরদ মালুম হচ্ছে বলে। কিছু মনে করো না ভাই।

হেসে উঠল নওরঙ্গী তার কর্কশ গলায়। তারপর সোয়ামির মাথায় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে বললে, সাধু-সন্ন্যাসীর শরীর খারাপ হতে নেই, তা জান তো? তবে তুমি ঘর-গিরস্থি আদমি কিনা, তাই মাথা ধরেছে!—এক বিড়ি হামকো ভিখ্‌সা দেও। ছিলম্‌ আওর নাহি পিউঙ্গা!

সোয়ামি তার ঝুলি থেকে একটি বিড়ি বার করে নওরঙ্গীর হাতে দিল, তারপর দেশালাই জ্বেলে নিজেই তার বিড়ি ধরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু আলোটা জ্বেলে হাত বাড়াতেই সে হঠাৎ

চমকে উঠল। শুধু যে নওরঙ্গীর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে তাই নয়, সেই জল গড়িয়ে যেদিকে নেমেছে, শরীরের সে-অংশটা পুরুষের নয়। নওরঙ্গী দড়িদড়া খুলে বসেছে।

যথাসময়ে দেশালাইয়ের কাঠিটি নিভে গেল। বীভৎস অন্ধকারটা ওইটুকু জায়গার মধ্যে বুকের উপর চেপে বসল, সেটার চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কে যেন সোয়ামির সহসা গলা টিপে ধরল।

এক হাতে বিড়ি টানছিল নওরঙ্গী, অন্য হাতে সোয়ামির কপাল টিপে দিচ্ছিল। সেই কঠিন কর্কশ হাতে কোথাও স্ত্রীলোকের মোলায়েম স্পর্শ নেই। কণ্ঠে বিন্দুমাত্র রসেরও অভাব, এবং আচরণ কোথাও আড়ষ্ট নয়। সহজ এবং স্বাভাবিকও বটে।

এক সময় নওরঙ্গী তল্পি থেকে আরও কয়েকটি বাদাম বার করে সোয়ামির হাতে দিল। সে-হাতখানা তখন ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। নওরঙ্গী বললে, খাও, দিনভর তুমকো খানে দেখা নহী! লেকিন বাদাম সে ভুখ রোখোগে, সোয়ামি?

ঠাণ্ডা কপাল এবার পাথরের মতো মনে হচ্ছে। সোয়ামির দেহে উত্তাপ যেন কোথাও নেই। নিশ্চল হয়ে সে পড়ে ছিল। নওরঙ্গী এবার প্রশ্ন করল, ক্যা হুয়া, ভাই?

কিছু না!—সোয়ামি এতক্ষণ পরে কথা বললে, লেকিন, কাঁদছ কেন তুমি?

নওরঙ্গী বললে, ও কিছু নয়। কাঁদবো কি দুঃখে? নেশার

ঝোঁকে অমন চোখ দিয়ে জল পড়ে। তা ছাড়া আমাদের জীবনে আছেই বা কি বল? ওঁ নারায়ণ।

সোয়ামি এবার সাহস পেয়ে বললে, তুমি মেয়েছেলে আগে বলনি কেন, নওরঙ্গী?

তাজ্জব কি বাৎ!—নওরঙ্গী সেই অন্ধকারে একবার হেসে উঠল। তারপর তার সেই ভৌতিক মুখখানা সোয়ামির মুখের কাছে এনে বললে, বুদ্ধু হ্যায় তুম্। সারাদিন ধরে আমাকে দেখছ, অথচ বুঝতে পারনি? চিম্‌টি-বাবার রুটি ছুঁলুম না, ডালের লোটা ধরলুম না—কিছুই দেখতে পেলে না? জেনানা-মর্দানাকা ফারাক্ নহী সমঝতে হো?

সোয়ামি যেন কেমন একটা যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে লাগল। কিন্তু একটি কথাও আর তার মুখে ফুটল না। মুখের ভিতরে একটা বাদাম দিয়েছিল, সেটা মুখের মধ্যেই রয়ে গেল। কেবল সে অনুভব করতে লাগল, অন্ধকারে ছাইমাখা একখানা কদাকার প্রেতিনীর বীভৎস হাসিমুখ তার মুখের উপরে সকৌতুকে চেয়ে রয়েছে জবাবের অপেক্ষায়।

নওরঙ্গীর হাতখানা কপাল থেকে গলার দিকে নেমে এল ধীরে ধীরে।

এক সময় সে জিজ্ঞাসা করল, শরম লাগতা ক্যা? ভয় পাচ্ছ?

সোয়ামির গলা বুজে এসেছিল। বললে, না।

জেনানা কভি নহী দেখা? তব্ দেখো—

সোয়ামি এবার একটু ব্যস্ত হয়ে বললে, তোমার এরকম

আচরণ আর আমার ভাল লাগছে না, নওরঙ্গী।—এই বলে সে ওঠবার চেষ্টা করতে গেল।

নওরঙ্গী এবার যেন একটু কেঁপে উঠল। হয়ত এখনও তার চোখ থেকে 'আঁশু' নামছে। মৃদুকণ্ঠে সে বললে, পর্মাৎমাকি মর্জি, সোয়ামি। অপনা হৃদয়মে হৃষিকেশ নে বৈঠে হ্যায়! উন্‌কো আনন্দকা খেল্! মায়া হি মায়া! মায়া ছাড়া ত্রিভুবনে কিছু নেই।

সোয়ামিকে উঠতে দিল না নওরঙ্গী। তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল সোয়ামির গলার কাছে। সে বলতে লাগল, শব্দ শোনো তোমার বুকের মধ্যে। নারায়ণের পায়ের শব্দ। মহারুদ্রের প্রলয় নাচনে কাঁপছে তোমার জীবন-মরণ,—আমারও বুকের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শোন, সোয়ামি! ঘর-গিরস্থি ছেড়ে তুমি পালিয়েছ, মায়াকে ছেড়ে কোথা পালাবে? কৌন্ লায়া তুমকো? কৌন্ সড়কসে তুম আয়া? সব মায়া! নারায়েণ!

সোয়ামি একটি কথাও বলতে পারছিল না। কিন্তু অন্ধ নেশায় মুখের একপ্রকার আওয়াজ করে সেই ঘনান্ধকার তাঁবুর মধ্যে নওরঙ্গী তাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে আঁকড়ে ধরে কাঁদছিল। সে-কান্নার শেষ নেই।

—পর্মাৎমাকি স্বোয়াদ মাংতা হ্যায়, সোয়ামি! কিছু না, কিছু চাইনে আমি! তোমার ভিতর দিয়ে তাঁকে চাই! আৎমাকো সাথ পর্মাৎমাকো যোগ! কুছ নহি বোলো, সোয়ামি! নারায়ণকা মর্জিমে সব কুছ্ হোতা! বাধা দিয়ো না, পায়ে পড়ি

তোমার! আ, যিৎনা জীউ, ওৎনাহি শিউ! পর্মাৎমাকি আশিস।
শিউয়া শম্ভো।

চিতাগ্নিকুণ্ড যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ওই আগুনে সোয়ামি দগ্ধ হবে।

অনড় অঘোর নিদ্রা ভাঙ্গতে কিছু বিলম্বই হয়েছিল। সকালের নরম রাঙা রৌদ্র পড়েছে সামনের ময়দানে।

ঘুম ভেঙে সোয়ামি উঠে বসল। এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু নওরঙ্গীকে দেখতে পেল না। কখন কোন্ সময় উঠে নিঃশব্দে সে কোন্‌দিকে চলে গেছে কে জানে। তাঁবুর বাইরে মুখ বাড়িয়ে সোয়ামি লক্ষ্য করে দেখল, ধুনি থেকে সামান্য ধোঁয়া উঠছে বটে, কিন্তু তল্পিতল্পা নিয়ে চিম্‌টি-বাবাও কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।